

Vol. 33 | No. 1 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শিল্পসাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

Volume	33
Issue	1
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	October 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v33i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i1.3
Pages	59-91
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শিল্পসাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

বেগম আকতার কামাল

ক. যুদ্ধ-প্রতিবেশ : শিল্পীর আয়ুধ, প্রতিসরণ

ফরাসী নাট্যকার জাঁ জিরাদুঁ ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে রচিত তাঁর (Tiger at the gates)[১] নাট্যে ট্রয়যুদ্ধের মিথকথায় অত্যাসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নাটকে চরিত্রেরা যুদ্ধরোধের জন্য নানা-রকম মন্ত্রণায় ব্যস্ত-উৎকণ্ঠ, কিন্তু সকল প্রয়াস-প্রতিরোধ ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত অতিতুচ্ছকারণে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। ভালোবাসা, প্রতিহিংসার মতোই যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি মানুষের আদিম, অপ্রতিরোধ্য কামনা; শুভবোধ ভেদ করে নগ্নরূপে এই প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে জার্মানী পূর্ব-স্বাক্ষরিত সন্ধিশর্ত লঙ্ঘন করে পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করে। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধাবস্থার মধ্যে প্রায় সবদেশ জড়িত হয়ে পড়ে। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের ভস্মগর্ভেই উপ্ত ছিল উক্ত যুদ্ধের সম্ভাবনা, যার ফ্যাসিবাদী-রূপের অঙ্কুরোদ্গমকে প্রথম নিরীক্ষণ করতে পেরেছিলেন পৃথিবীর আত্মসচেতন, বিবেকবান শিল্পী সাহিত্যিক। তিরিশ দশকের প্রারম্ভেই তাঁরা ব্যাপক ও সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন ফ্যাসিবাদ-বিস্তারের ক্রমগতিকে রুখবার জন্য। প্রথমত শান্তিসম্মেলনের অবয়বে তাদের যুদ্ধবিরোধী চেতনার ঘনীভবন ঘটতে থাকে, বিশেষত এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের প্রতিবাদস্বরূপ ২৭-২৮শে আগস্ট, ১৯৩২-এ অনুষ্ঠিত আমস্টার-ডামের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। আঁরি বারব্যুস ও রোমাঁ রোলারাঁ নেতৃত্বাধীন এই সম্মেলনই পরবর্তী ধাপে ফ্যাসিবিরোধী কার্যক্রমে পরিব্যাপ্তি লাভ করে।[২]

অবশ্যম্ভাবী-যুদ্ধের কালোছায়া শিল্পীর চৈতন্যে পূর্বেই আশঙ্কার ছায়াপাত ঘটায়, তাঁর রূপরচনার ক্রিয়াশীলতায় আততি ও আধির প্রচ্ছায়া বিচ্ছিন্ন

দেয়—কেননা জীবনবাস্তবতার মধ্যেও যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য-উপপ্লবের প্রভাবটি থাকে অব্যবহিত। এরকম সংশয়াচ্ছন্ন চেতনার অভিক্ষেপে এক অর্থে বাস্তব-সংকটের রূপটাকেই পূর্বাহ্নে অনুভূত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ১৯১৬ খৃস্টাব্দের দিক থেকেই দৃষ্ট হচ্ছিল একটি টেনশনের ক্ষোভ—তাঁর 'ন্যাশনালিজম' বক্তৃতায় সেই ক্ষোভের সূত্রটি অন্তর্নিহিত আছে। একজন সমাজবিদ বা ইতিহাসবেত্তা যুদ্ধকে নির্মোহ দৃষ্টিতে কার্যকারণ-সমেত বিবেচনা করেন। এমনকি যুদ্ধকে সাবিক সমাজ-প্রতিবেশে কেউ কেউ সুসময় হিসেবেও চিহ্নিত করে থাকেন।[৩] এরকম স্বীকৃতির তথ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে দর্শনবেত্তা-ইতিহাসবিদের মতাদর্শে—এমনকি গীতার নিষ্কামধর্মতত্ত্বে, ক্রুসেডের আখ্যানে, জেহাদের ইতিকথায়। কিন্তু একজন শিল্পী যুদ্ধ-প্রসঙ্গে নিরাসক্ত-দৃষ্টির পোষকতা করেন না। যুদ্ধভিত্তিক প্রাচীন মহাকাব্য, বীরগাথাগুলোও রচয়িতার অন্তর্গূঢ় চিত্তের সমর্থনধন্য নয়, বরং ধ্বংসের অন্তিমবিষাদই সেখানে প্রতিপন্ন হয়ে উঠেছে। তবে সাবিক অর্থে প্রথম মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধই একটি বীরত্ব সূচকতায় বৃত্তাবদ্ধ ছিল, মানব-প্রজাতির সংগ্রাম ও উর্ধতনের অনুষঙ্গে গ্রন্থিত ছিল, এসব যুদ্ধস্তুতি, বীরবন্দনা, উৎসাহ-উদ্দীপনার আলম্বন-বিভাবধৃতিই বড় বড় শিল্পরচনার উৎস-উপাদান সরবরাহ করত।

ঐতিহাসিক অর্থেই প্রথম মহাযুদ্ধ ভেঙ্গে ফেলে যুদ্ধ-অনুষঙ্গের পূর্বতন শৃঙ্খলকে—অবশ্য এর আগেই আমেরিকার উনিশ শতকীয় গৃহযুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞান যুদ্ধের চারিত্র্যে দ্বিঘাতের সৃষ্টি করেছিল, অন্তর্মূলের দিক থেকে যুদ্ধ-ধারণাকে বদলে দিচ্ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের বধ্যভূমিতেই শিল্পী তার শিল্পভাবনার আয়ুধ নিয়ে অস্তিত্বের নব্যদৃষ্টিকে সচকিত করতে চাইছিলেন। রাজনীতির ভাবাদর্শে বা জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা-বিদ্ধ হয়ে নয়, তাদের সংকটমুহূর্তগুলো যুদ্ধের অর্থহীন তাৎপর্য নিয়ে আত্মনিবিষ্ট হতে থাকে; তাদের রোষ ও আত্মদানের প্রহেলিকা অনন্বয় রূপতায় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। প্রচলিত যুদ্ধগাথার অসাড়ত্ব প্রতিপন্নতায়, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে এবং একই সঙ্গে অস্তিত্বলয়ের বেদনায় প্রচুর যুদ্ধবিরোধী কবিতা লেখা হতে থাকে—যার প্রতিবোধন-লক্ষ্যে জীবনমমত্ব হয়ে ওঠে মৌলিক প্রশ্নের বিলোকনে জিজ্ঞাসু। মৃত্যু ও বেঁচে থাকার মধ্যবর্তী অবস্থানের প্রচ্ছায়ায় এক ধরনের চিরায়ত করুণা যেমন উন্মোচিত হয়েছে, একই

সঙ্গে দীপ্ত হয়েছে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা। ১৯১৭ সালে সিগফ্রয়েড সেসুন (১৮৮৬-১৯৬৭) যুদ্ধবিরোধী ঘৃণার কবিতা লিখলেন, তারপরে আরও একে একে উইলফ্রেড ওয়েন, আইজাক রোজেনবার্গ, চার্লস সর্লে, আপোলিয়েনর, রেনে আরকো, আলেকজান্ডার ব্লক, পাস্তেরনাক, উনগারেত্তি, রবার্ট লীফ্রস্ট, কার্ল স্যান্ডবার্গ এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। বধ্যভূমির রক্তকোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন ও প্রতিবেশ-প্রকৃতি হারিয়ে ফেলার শূন্যতায় এঁদের কবিতা একই পাত্রে ধারণ করেছে যন্ত্রণানুভব ও প্রতিবাদ। কিন্তু নিরঙ্কুশ রাখতে চেয়েছে শিল্পরচনার সৃজনক্ষমতা ও ক্রিয়াশীলতাকে।[৪]

প্রাচীনসময়ে শিল্পীদের ম্যারাথন লড়তে হতো—ইস্কিলাস লড়েছেন, আবার শান্তির-প্রতিবেশ সৃষ্টিকল্পে, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারার্থে শিল্প রচনা ও চিন্তার পরিচর্যাও করেছেন। বর্তমানে শিল্পী ঐ জাতীয় দ্বিচারিতায় বাধ্যত বিশ্লিষ্ট থাকেন না, সামগ্রিকভাবেই যুদ্ধ পরিবেশে তাঁর চিন্তাবিশ্ব ও শিল্পকলার প্রতিরক্ষার্থে তাঁকে প্রায়ই লড়তে হয় নিজেরই প্রকল্পের সঙ্গে, আত্মবিশ্বের শঙ্খলাভঙ্গের দ্রুতলয়ের সঙ্গে, কখনও বা পূর্বসৃষ্ট রূপমূর্তির বিরুদ্ধেও—যখন তা মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশ বৎসর বসবাস করেছেন তাঁর গীতবিতানধৃত বিশ্বলোকের বিভঙ্গ-চৈতন্যে, অনুবিশ্বের শতধাখণ্ডিত রূপের মধ্যে এবং অনেকাংশে মনো-বাস্তবতার গহন জটাজালে—যন্ত্রণায়-ক্ষোভে। দুই দুইটি যুদ্ধ-প্রতিবেশে কৃষ্ণ-অরূপতায় 'স্থলজলবিস্তারি আকীর্ণতায়' তিনি যেন 'এক শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় উৎক্ষিপ্ত', স্মর্তব্য 'প্রান্তিকের' (১৯৩৮) শিরোনামহীন কবিতা-গুলো—যেখানে আনন্দময় প্রতীতি সুতীব্র একাকীত্বের দায়িত্বে অঙ্কুশবিদ্ধ—শুধুই শুভার্থি ভাবিকথকের ভূমিকায় 'নিছক আশঙ্কাবাণী আশ্বাসবাণীতে' পরিবৃত না থেকে সন্ধিমুহূর্তকে-অন্তবর্তীকালকে শিল্পীচিত্তের সংক্ষোভে প্রবিষ্ট করানো। অথবা উল্লেখ্য হয়ে উঠে তাঁর চিত্রকলার প্রসঙ্গ, নাট্যপ্রসঙ্গও—রূপকে, ছায়াময়—প্রতিরূপের আকারে পরাবাস্তবের অবতল-বিধৃত করায় যেখানে অধীর, কালিক পরিসীমায় চতুর্মাত্রার সংযোজনায় উৎকণ্ঠ। শিল্পময় জীবন যাঁকে যাপন করতে হয়; তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের গোপন ব্যূহ নির্মাণ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়—যখন বহির্জগতে সবকিছু ধ্বংস-প্রাপ্ত হচ্ছে, ভস্মসাৎ হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছর গুলোতে জার্মানি

কর্তৃক অবরুদ্ধ প্যারিসে বসে 'গোয়েনিকার' রূপকার পিকাসো শৈল্পিক প্রতিবাদী—ধৈর্য নিয়ে যুদ্ধ-বীভৎস রূপের প্রত্যক্ষ দৃশ্য না এঁকে জীবনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন দৃশ্যগুলোর ভাঙ্গাচোরা ছবিকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে থাকেন। পিকাসোর জীবন ও শিল্পে যুদ্ধের একটি অন্তর্শায়ী ভূমিকা বিদ্যমান। কখনও বা মাধ্যমবদলের সূত্রে লিখে যান নাটক, সেটা রিহার্সালের মধ্য দিয়ে সহশিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে ঐকান্ত্য থাকেন—নিষ্প্রদীপ রাত্রে নাট্যের মড়হা দেন—তাতে অবয়বহীনতায়, প্রচ্ছায়ায় তাঁর প্রতিরোধ ও যুদ্ধবিরোধী অনুভূতির অবৈকল্যই ধরা-অধরার প্রান্তবর্তী হয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে প্যারিসে বসে রচিত হয় *Desire Caught by the Tail* এবং ১৯৪৭-এ *The Four Little Girls*. প্রথমটিতে পিকাসোর পাত্র-পাত্রী মানুষ নয়, জীবজন্তুও নয়, বিশেষ বিশেষ অনুভব মাত্র। 'গোর্য়েনিকায়' স্পেনের গৃহযুদ্ধের যে প্রত্যক্ষ রূপের বহু-মাত্রিক বিন্যাসটি অঙ্কিত হয়েছিল, তা থেকে তিনি ক্রমে মনুয়রীতির অনু-শীলনে চলে যেতে থাকেন। এমনকি নাৎসী-অবরোধের সময়কালে আঁকা ছবিতে পিকাসো সরল গড়নের দিকে অগ্রসরমান—যেখানে পূর্বতন কিউ-বিজমের বলিষ্ঠ বাস্তবতার জ্যামিতিক বৃত্তটি পরিহৃত হচ্ছে। যুদ্ধ-প্রতি-বেশে নাট্যরূপে এই শিল্পী যেমন ছবির প্রতিমাকে নির্বস্তুক করেন, অথচ অনুভবে উদ্ভট সমাবেশ ও আপাত বিশৃঙ্খল প্রবাহ রচনা করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তেমনি 'যুদ্ধ ও শান্তি' শীর্ষক (১৯৫২) বিরাট ক্যানভাসে গোর্য়েনিকার ঘোড়াকে বদলে দেন পক্ষীরাজের রূপমূর্তির মধ্যে—এই পক্ষীরাজ তাঁর দ্বিতীয় নাটকটির একটি প্রতীক-চরিত্র হিসেবে ১৯৪৭-এ বিধৃত হয়েছিল। মনুন্তর কালে—যাকে স্বয়ং পিকাসো বলেন Chaos—মানবজীবনকে স্বস্থ ও সক্রিয় রাখবার পক্ষে শৈল্পিক সংগ্রামও এক ধরনের প্রয়াস—এই প্রয়াসেই তিনি ধ্বংসের মাঝখানে নাটক ও ছবির ক্রিয়াশীলতায় নিমগ্ন থাকেন।

তবে কারও ক্ষেত্রে অসহযোগী-নীরবতাও দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে—ইয়েট্‌স প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়ে কোন কবিতাই লেখেন না—কারণ মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে তিনি কোনরকম বীরত্ব-বাসনার অনৃত-রূপ সৃষ্টি করতে চাননি। মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই দুর্ভোগ বীরত্বহীন বলেই তাঁর ধারণা, 'আমার মনে হয় এমন দিন কালে নীরব থাকা ভালো কবির,' যেখানে

পিকাসো বলেন, 'ধ্বংসের মধ্যেও মহান সৃষ্টি সম্ভব'। চৈতন্যের আয়তন বদল কিংবা জগৎ বিশৃঙ্খলার পূর্বধরন বদলে যেতে পারে—তবে মনোবিশ্বের জাড্য ঘুচে গিয়ে অনেক শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণটি হতে পারে অর্গল-মুক্ত—যদি সে-উৎসারণ অভিমুখ্য হয় স্বদেশসত্তা-স্মৃতির অন্তর্মূলের দিকে—যে-মূলে বাস্তবতার অন্তর্বাহী-সংজ্ঞার্থ নতুন তাৎপর্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত বোধকরি জীবনানন্দ দাশ। মনোবাস্তব—প্রত্নবিশ্বের পদাতিক এই কবি দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে অনুবিদ্ধ হন মানুষের উর্ধ্বতন-কামনার-প্রতীতিতে, "নব নব মৃত্যুশব্দ বক্রশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন / অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন", (সময়ের কাছে)। এই প্রতিজ্ঞেয়-চেতনা পরাজগৎ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়নি, এর অন্তর্মূলে অঙ্কুশের মত বিদ্ধ হয়ে আছে রূপসী বাংলার রূপান্তরিত-প্রতিবেশ—ধানসিঁড়ি নদীর সমীপবর্তী গ্রাম, চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত যেখানে হয়ে যায় কলকাতার ফুটপাথ (দ্রষ্টব্য '১৯৪৬-৪৭' কবিতা)। তাঁর সার্বভৌম প্রতীকময়তার মধ্যে ঢুকে যায় যুদ্ধের অনতিক্রম্য অস্থৈর্য, নৃত্যের পটভূমিতে জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রে যেখানে 'পাতাদের উৎসরণে কোন শব্দ নেই'—সেখানেও নৃত্যরত মানবমানবী 'টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে / বিনষ্ট হইতেছে সাংহাই।' (গোধূলিসন্ধির নৃত্য)। যুদ্ধ সবকিছুর অধোগতি করেছে—নেমেছে মানুষের চৈতন্যেও ধ্বস—তবুও অধৃষ্য-কবির প্রতিমান অনড় থাকে,··· যুথচারি কয়েকটি নারী। ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে/ মেধাবিনী···।" (ঐ)

যুদ্ধের পরিপ্লব কবিস্বভাবের বক্রতা-হ্রেতাভাস-গূঢ়ৈষণার ধূম্রজাল ছিঁড়ে দিতে পারে এবং তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে মানবীয়তার স্পর্শকে ধ্রুবত্ব দিতে পারে—এরকমটা ঘটেছে অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে। কারণ মন্বন্তর-কালটায় পর্যুদস্ত হয়ে মানুষের অন্তিকমানবত্ব নিকষিত-হেম হয়ে ওঠে। আবার উচ্ছ্বাসপ্রবণ—উচ্চকণ্ঠ কবির পৃষ্ঠদেশে যেন যুদ্ধকালটাই সওয়ার হয়ে চেপে বসে, তাঁর মধ্য দিয়ে দুঃসময়ের অন্তর্দেশ উদ্দীপনার সামীপ্যেও ঋজুভঙ্গিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় সুকান্তের কবিতা—ঝড়, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গার প্রাসঙ্গিকতায় তাঁর কবিতা বোধি-অর্জনের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতায় অনুস্যূত। বস্তুত, প্রত্যাহত-পরিপার্শ্বে বসবাসরত শিল্পীর অভিজ্ঞান তাঁর রূপরচনার পরিকেন্দ্রে অয়স্কঠিন রূপ পায় এবং ফলত শিল্প-বিশ্বের সঙ্গে শিল্পীর দায়বদ্ধতার সমস্যাটা অনোন্যনির্ভর হয়ে ওঠে। আরাগঁ

এই-অভিযান সম্পর্কে বলেছিলেন, "শুধুই অশ্রুপাতে কিছু লাভ নেই, ভাঙা হৃদয় তাতে জোড়া লাগবেনা। ছারখার বাড়ি কারো আর ফিরবেনা।··· লন্ডনেই হোক বা প্যারিসেই হোক, আমাদের অশ্রু আজ মিশেছে শূন্যক্রোধে, ঘৃণায়।"[৫] সৃষ্টিশীল অন্তর্দীপ্ত মানুষগুলোর ক্ষেত্রে দুঃসময় সূচিত করে তীব্র আন্তঃচাপ—এ সময় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকে হারালে চলেনা, সরে আসলেও চলেনা। গোপনে-প্রকাশ্যে নানাবিধ আয়ুধ ব্যবহারে—আবিষ্কারে তিনি সৃজনক্ষম প্রজ্ঞাকে অব্যাহত রাখতেই সচেষ্ট থাকেন।[৬] ঐসব আয়ুধ হতে পারে ফর্মের মুখোশ, মাধ্যমবদলের অনুজ্ঞা অথবা ভাবাদর্শের দিকবদল। এ অর্থেই কি রবীন্দ্রনাথ বিশ-তিরিশ দশকে তুলি হাতে নেন এবং বীভৎস-বাস্তবকে প্রতিহত করবার লক্ষ্যে প্রতিমানকে ভেঙ্গে দেন রঙের জগতে? যে-প্রপঞ্চ ভেঙ্গে দিচ্ছিল ক্রমাগত বস্তুরাজ্যের বিশৃঙ্খলা, এক অর্থে সে-বাস্তবকেই যেন প্রতিরোধ করতে চাচ্ছেন চিত্রকলার মধ্যে তার স্বভাবের বিপরীতধর্মী বিষণ্ণতার বর্ণবিন্যাসে—যেখানে জড়তে জীবনযোগের মাধ্যমে 'অজীবজনকে আবিষ্কারে উন্মুখ।' ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে পিকাসো কিভাবে তাঁর নাট্যে দীর্ঘস্থায়ী রুদ্ধ-পরিপার্শ্বের প্রতি ধিক্কার ব্যক্ত করেন এবং অধিবাস্তবকে সংগোপন-রূপমূর্তির মধ্যে লালন করে যান, প্রতিরোধ গুপ্তশক্তিতে ধরে রাখেন সৃষ্টিশীল আবেগকে—যা বিষাদ-ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণতায় প্রাণশক্তির প্রবলতায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে এবং শেষত অভিমুখী হয় ক্রম-সারল্যের চিরায়তরূপের প্রতি। পিকাসো শেষের দিকে প্রত্যাবর্তিত হন আদি পৌরাণিকতায়—যেন সভ্যতার পাপের বিরুদ্ধে যেতে চান।

যুদ্ধকালের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী তাঁর রচনাক্রিয়ার আয়ত-অবস্থানকে হারাতে পারেন—ইতিহাসে তা ঘটেছেও। নাৎসি-বর্বরতার উত্থান-প্রতিষ্ঠা-পর্বে জার্মানির শিল্পী সাহিত্যিকের স্বেচ্ছানির্বাসন এর সাক্ষ্য—আমাদের মনে পড়ে ব্রেশটের বিখ্যাত কবিতাটি Die Auswanderung der Dichter অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত[৭]—

হোমারের বাড়িঘর বলতে কিছুই ছিলনা।
আর দান্তেকে গৃহী হওয়া সত্ত্বেও গৃহ পরিহার করতে হয়েছিল।
লি-পো আর তু-ফু পথহারা সেই গৃহযুদ্ধবিগ্রহের
তিরিশ মিলিয়নের মতো মানুষকে যা গিলে ফেলেছিল
অয়রিপিদিসকে মানুষ মামলা দিয়ে ভয় দেখিয়ে চলছিল

আর চেপে ধরা হয়েছিল শেকস্‌পীয়রেরও টুঁটি।
ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁকে শুধু শিল্পসরস্বতীই নয়
পুলিশরাও খুঁজে বেড়াত।
'প্রিয়তম' আখ্যায়িত
লুক্রেশিয়াসকেও যেতে হয়েছিল নির্বাসনে
আর হাইনেকেও এবং ঠিক সেই মতোই
ব্রেশটকেও ভিড়ে যেতে হয়েছিল ডেনমার্কের ছনছাউনির আড়ালে।
(কবির নির্বাসন)

অন্য অর্থে শিল্পী বিষয়পরিগ্রহণেও উত্তরোত্তর বাস্তব-দূরবর্তী প্রতিবেশে অভিগমন করতে থাকেন—জীবনকে প্রতিমানের অবৈকল্যরূপে সার্বভৌমত্ব দেওয়ার জন্য এবং সে-সঙ্গে বাস্তব-ভগ্নতার সঙ্গে বিপ্রতীপ-সম্বন্ধ গড়ে তোলবার বিভাবে। কাহিনীর পটভূমি সন্ধানকল্পে ধাবিত হন অর্থাৎ দৈশিক অভিজ্ঞতাকে কালিক তাৎপর্যে বিমণ্ডিত করেন। সময়ের দুঃশাসন-পর্বে স্বেচ্ছানির্বাসনে দেশত্যাগী টমাস মান জোসেফ কাহিনীর প্রতিমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বধ্যভূমিতে ঘুরে বেড়ান, ফাউস্টের রূপকল্পে নাৎসি শক্তির প্রতিভূ বিনির্মাণ করেন। সার্ত্রে লেখেন অরিস্টিস মিথকথায় ফ্যাসিস্ট বর্বরতার পাপ ও প্রতিশোধের আলেখ্য। এবং ব্রেশট তাঁর এই-সময়ের কবিতায়-নাট্যে শিল্পীর নির্বাসন-বেদনাকে যুদ্ধবিরোধী প্রতিরোধের অর্থে ভরিয়ে তোলেন। বিশেষত তাঁর নাট্যরূপে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে নাৎসি সর্বনাশের ক্রমবিন্যাস প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়াচ্ছিল প্রগতিশীল মানুষের ক্রমবিনাশের পটে (১৯২৩-'৩৩ পর্যন্ত তাঁর রচনাবলী দ্রষ্টব্য), নির্বাসন-কালে তিনি 'অনাহত সংগ্রামী বিবেক'কে পুনর্গঠন করেন, এপিক নাট্য-তত্ত্বের অন্তঃশরীর গড়তে থাকেন—যেখানে ব্রেশট আতঙ্কিত পৃথিবীর সম্মুখে মানবকাহিনীর অজেয় প্রতিবাদের বিশ্লেষণাত্মক রূপমূর্তির বিজয়-কেতন উড়িয়েছেন—১৯৩৮-৩৯-এ রচিত 'গ্যালিলিও' নাট্যের দীর্ঘ-অবয়ব সমকালীনতায় ভরপুর থাকে—নাৎসি-আধিপত্যের সন্ত্রাসে ঘেরা থাকে।

বস্তুত ব্রেশট্ সমকাল ও দুবৃর্ত্ত-প্রতিবেশের টানাপোড়েনে ব্যক্তিগতভাবে যেমন বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন তেমনি চারপাশের মানুষগুলোর অবস্থানগত স্বরূপকেও নিজ সিদ্ধান্তের উপপাদ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অঙ্গীকার-প্রবণ

মনোবিশ্বের অনুষঙ্গ লাভ করেছেন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়পট থেকেই। এবং আরও লক্ষযোগ্য যে ব্রেশট তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের যুক্তিযুক্ত পরিনতির পূর্বে অর্জন করেছিলেন নান্দনিকতার অন্তর্দীপ্তি—উত্তাল বিপ্লবভাবনা নীতিকথার উচ্ছ্বাস থেকে তিনি যুদ্ধশেষের পর্যায়ে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরাজিত থাকেন,—জীবন-নীতি-বিজ্ঞান-বিপ্লব—সবকিছুই যেখানে উত্তীর্ণ হয়েছে শিল্পমাত্রায়। প্রাসঙ্গিক কাজগুলো হচ্ছে জননী সাহসিক সেজুয়ানের সৎমমণী, চকসার্কেল, করিওলেনাস ইত্যাদি এবং ১৯৪০-এর পরবর্তী কবিতাগুলো। ব্রেশট শেষাবধি জীবন-নির্মাণের রূপককে নন্দনমাত্রার প্রতীকের সঙ্গে অনুস্যূত করেছিলেন। এরকমটি সবদেশের শিল্পসাহিত্যে সমান্তরাল ছিলনা—দেশকালভেদের ভিন্নত্বে শিল্প-প্রতিমানের চেহারাও নানারূপ ধারণ করেছিল। তবে এ সত্যও স্বীকৃত যে, সংকট-প্রতিধ্বনিময় সকল শিল্পরচনাই চূড়ান্ত অর্থে নতুন বাস্তবতার দিগন্তই স্পর্শ করতে চেয়েছে।

যেমনটি লক্ষ করা যায় ফ্রান্সের শিল্পীদের বেলায়—আরাগঁ পরাজিত প্যারিসের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রতিরোধের নায়িকা খুঁজে নেন ক্রবাদুরদের মানসী দাকিতেন-প্রতিমায়—সংবেদন ও প্রতিবাদের যুগ্ম-ব্যঞ্জনা রচনার ঈপ্সিত নান্দনিকতায় তৎকালীন ফ্রান্সের শিল্পবিশ্ব হয়ে ওঠে প্রদীপ্ত। বিষয়ের স্বকীয়ত্ব—যাকে বিষ্ণু দে বলেছেন 'অরিজিন্যালিটির বিত্তবান সন্ধান'—বাধ্যতই বিসর্জিত হয়, যে-কোন কাল ও ঘটনা এসে বর্তমানের ধ্বংস-প্রতীকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে থাকে। এমনকি বর্জিত হতে থাকে রচনায় চমৎকারিত্ব সঞ্চারের চালাকি, আত্মবৈপরীত্য ও অবক্ষয়ের শিল্পসুলভ কারসাজি ও রূপসজ্জার অনাবশ্যক কলাকৌশল। মূলঅর্থেই শিল্পরূপ পূর্ব অনুকল্পগুলো ভেঙ্গে নানা উৎসে ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাবস্থা থেকেই। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার আবশ্যকতা রাখে।

মোটামুটিভাবে উনিশশতকের শেষার্ধ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিল্পরীতি একটি বৃত্তময় আত্মসংবিদে পর্যবসিত হচ্ছিল—যাকে ব্যক্তিসর্বস্বতার তুঙ্গ অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু মৌল অর্থেই লক্ষণীয় যে, এসময় শিল্পের উপাদানগুলো পরস্পরবিরোধী-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আন্তরসংযোগের ন্যায়কে হারিয়ে ফেলছিল—বিশেষ করে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে শিল্পসাহিত্য পূর্ববর্তী রোমান্টিক চৈতন্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল। বস্তু-

সংলগ্ন চৈতন্যের সুমহান উদ্ভাসনের মহামুহূর্তগুলো তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং শিল্প ও জীবনকে সেই বিচ্যুতির মধ্যে অভিক্ষিপ্ত করে তোলে। রোমাণ্টিকতার ভাঙন কিভাবে শিল্পকে জীবন থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল তারই আলেখ্য এলিয়টের The Waste Land—যেখানে কোন কেন্দ্রস্থিত-সত্তা নেই, মুহূর্তের উদ্ভাসনধৃতি নেই, অভিজ্ঞতাগুলো ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অংশে বিভক্ত এবং সারাৎসার-বিহীন, শিল্পরূপে সারাৎসার রচনার সার্বভৌমত্ব পরিহৃত হয়, পরিবর্তে ফর্মের অতিশায়িত-বিকাশ ঘটতে থাকে। কিভাবে শিল্পী কালিক অভিজ্ঞতাকে অপসৃয়মাণ সময় থেকে উদ্ধার করে রূপ দেবেন—সে-জিজ্ঞাসায় আন্দোলিত হতে থাকে ফর্ম এবং অন্তর্সূত্র হিসেবে এই আন্দোলনে যুক্ত থাকে ব্যক্তিময়তারও সংকট; বস্তুর সঙ্গে তার চেতনার বিপ্রতীপ সম্পর্ক এবং নির্বিচার, নিঃশর্ত সাপেক্ষতায় শিল্পবিশ্বকে তাৎপর্য-দেওয়ার ইচ্ছা, প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তীতে জার্মানিতে উদ্ভূত, ক্ষণস্থায়ী এক্সপ্রেশনিজম ফর্মের প্রাসঙ্গিকায় প্রথমে কেন্দ্রিক-অভিধা গঠনের ভাববাদী প্রকল্প অনুসৃত ছিল বটে, কিন্তু শেষত তাতে ফুটে উঠেছে জ্বরস্ফিত রক্তাভ মুখচ্ছবিরূপ, নিশ্বাসের অনিয়মিত চলাচল। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার আইডিওলজিক্যাল প্রহেলিকা হয়েই রীতিটির শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। অর্থাৎ মহাযুদ্ধ-সংঘটনের পূর্বকালটা থেকেই শিল্পরীতি আসন্ন দুঃসময়ের অন্তর্চাপকে বহন করছিল নিজ অবয়বে। ইতিহাসের নিয়মে রীতিবৈচিত্র্যের ঐসব উদ্ভাবনায়-বিচারণায় জন্মসূত্রেই উপ্ত ছিল এক একটি অবক্ষয়ের বীজ। কেননা চৈতন্যের কাঠামো সেখানে অবিকৃত-স্থানে যেহেতু নেই—এবং বাস্তবত মানুষ আরও বেশি আকারবিহীন, ইচ্ছা-রহিত এবং জড়ত্ব-পেশীশক্তির পদানত—এরকম বিশ্লিষ্ট-ভিতের উপর দণ্ডায়মান সংশয়বোধ-লালিত ডাডাইজম, ফবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ইমপ্রেশনিজম, সুররেলিয়জম ইত্যাদি ফর্মের পরস্পরবিরুদ্ধ উপাদানসমূহ আন্তঃ-সংযোগের সূত্রই খুঁজত। সমাজগত ক্ষেত্রে এসবের মধ্যে ছিল অনিশ্চয়তা, সংকটধৃত ব্যক্তির পরিকেন্দ্র-চ্যুতি, দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে বিধৃত ছিল যুক্তি-বিরুদ্ধ উপায়ে কেবলই অন্তর্চেতনার অনুভূতিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নৈতিকতার উৎসে যে-কোন মূল্যে সত্যে উপনীত হওয়ার সংকল্পই ছিল ঘোষিত। অর্থাৎ জীবনের অধিবাস্তবের মধ্যে এসব ইজম পুরোন-প্রচল রূপকল্পের পরিবর্তে সর্বাংশেই নতুন প্রতিমান দিয়ে বাস্তবকে ধরবার আকুলতাই পোষণ করত—এই বাস্তবতা প্রচল বোধ-যুক্তি-বিজ্ঞানের বহির্ভূত

কল্পনার প্রতিন্যাস দিয়েই আবিষ্কার করা সম্ভব। এখানে অনুধাবনীয় যে, পূর্বে মানুষ জগৎ-বিষয়ক চিন্তভাবনার ক্ষেত্রে যেসব দর্শনভিত্তিক সংশয়, যুক্তি ও জিজ্ঞাসাবোধের পরিশীলন করতো—যেমন দেকার্তের সংশয়বাদ, অথবা সাধুসন্তের ঈশ্বরসন্ধান, রোমান্টিক কবিদের 'এপিফেনি'—সার্বভৌম কল্পনার উদ্ভাসন ইত্যাদি থেকে আলোচ্য-সময়ে উদ্ভূত সংশয়বোধ মূলে-স্থূলেই পৃথক, অনেকাংশেই প্রতিস্পর্ধী। এখানে চিন্তা করবার মাধ্যম যে মন—তা-ই যেন হয়ে গেছে বিপন্ন, বিশৃঙ্খল এবং কখনও-বা বিমানবিক বিষয়াশ্রয়ে অর্পিত।

ইডিপাস প্রাচীনকালে নেমেসিসের ভয়ানক ক্রোধ জ্ঞাত হয়েও সত্যের বিশ্লেষণে উচ্চকিত ছিল। একালের মানুষ সে-ধরনের ট্র্যাজেডি বোধের অন্তর্যুক্তি থেকে দূরবর্তী, নিয়তিনির্ভরতার কার্যকারণ থেকে ভ্রষ্ট, কিন্তু যে ঘটনা তার সৃষ্ট নয়, সেই সব ঘটনার স্রোতে ভেসে-যাওয়ার অনিবার্য-তাকেও সে রোধ করতে পারছেনা, তার সঙ্গে যৌক্তিকতায় অনুবদ্ধও হতে পারছেনা। বিশেষত দুই-দুইটি মহাযুদ্ধের অনিশ্চয়তা ও আধি তাকে বিপন্ন করেছে অন্তর্জগতের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি, যন্ত্রযুগের চাপ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধযুগের সন্ধিকালকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, ব্যক্তির—অবয়বকে নিরর্থক করেছে। এলিয়ট এরই প্রচ্ছায়ায় তাঁর নন্দনবিশ্বের জগৎ গঠন করেন। খণ্ড খণ্ড ইমেজ রচনার মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া জীবনের টুকরোগুলো সেখানে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এবং একটি অনুকল্পের মধ্য দিয়ে জীবনমানের নতুন ভাষ্য রচনার সূত্র খোঁজা হয়েছে। বস্তুত সদর্থক অর্থেই শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পালাক্রস ঘটছিল—যাতে অংশগ্রহণের যাথার্থ্য শিল্পীদের অন্তঃচালিত করেছে, স্ব স্ব ইজমচর্চার অনুশাসনমুক্ততায় নতুন যুক্তিন্যায়কে শিল্পসৃষ্টির কাজে খুঁজে নিতে হয়েছে। এ-সূত্রেই পিকাসো যুদ্ধ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন; সুররিয়েলিস্ট কবিরা মার্কসবাদের বৈপ্লবিকতায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের মৌলিক লক্ষ ছিল সেই অন্তর্লীন-সত্যকে শিল্পের জগতে পুনর্বাসিত করা—যে সত্য মানুষের চৈতন্যবান সারসত্তাকে তাৎপর্য দেয়, তার বাস্তবের স্থায়ী কাঠামোকেও গড়ে নেয় এবং প্রতিপাদিত করে যে চিন্তার মধ্য দিয়েই মানব-প্রজাতি সকল ঘটনা ও দুঃসময়ে জীবনযাপন করে যাবে। ফ্রান্সে ইতোপূর্বে নন্দনতত্ত্বের ধ্যান-

ধারণার অতিশায়ী পরিচর্যা চলছিল, তার পরিবর্তন-পথটি যুদ্ধের প্রাক্কালে উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেখানে বিশুদ্ধ শিল্পভাবনার প্রতি-একটা উদ্যত প্রবণতার অভিক্ষেপ বিরাজমান ছিল; আকাডেমিক পরিচর্যা ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাব-ধারার সংঘাতময়তাও কম ছিলনা। কিন্তু যুদ্ধধ্বস্ত পরিবেশে তাদের জীবনে, শিল্পীর চেতনায় কমিটমেন্টের যে-উৎসারণ ঘটল, তা আর আকাডেমিক নির্ভর রইলনা। তা তাদের জীবনের বন্দী সময়গুলোর প্রান্তিক অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, শিল্পকে দায়িত্ববোধে নতুনভাবে ধারণের সদিচ্ছাও জন্মেছে—যার পশ্চাতে ছিল ফ্যাসিবাদ-প্রতিরোধ, গণ-অভ্যুত্থানের অমিতশক্তি, সংগ্রামের আবেগ—নৈরাশ্যের গর্ভ থেকে, নিরীশ্বরবাদের শূন্যতা থেকে উদ্ধার। যুদ্ধকালে ফ্রান্সের চিন্তাধারায় ইজমচর্চার কালিক অভিজ্ঞ-তার একমাত্রা ও ঝোঁক দূরীভূত হয়ে দৈশিক রূপকল্পের সংযোজন ঘটল। লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতজ্ঞ 'সমুদ্রের মতো মৌন অসহযোগে' গেস্টাপোর মারণযজ্ঞে তাঁদের জীবনমৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন সময়ের হাত থেকে নিষ্কাশন করে পরস্পরসংলগ্নতায় দৃশ্যগ্রাহ্য করতে চাইলেন। এই পট-প্রেক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে সার্ত্রে-ক্যামুর অস্তিত্ববাদ, আরাগঁ-এলুয়ারের সাম্যবাদ, বেকেট-আয়েনেস্কোর এ্যাবসার্ড তত্ত্ব। নিরর্থক মৃত্যুকে মহিমান্বিত করবার যে-প্রয়াস তাঁরা পোষণ করেন, তারও অধিক ব্যাপৃত থাকেন অস্তিত্বের স্বাধীনতা ও দায়িত্বের প্রশ্নে নিরাপোষ, অনপেক্ষ। মানব-প্রজাতির যুদ্ধ-প্রবণ মানসিকতা কিংবা অশুভবোধকে শিল্পীরা পাপবোধের সার্বভৌমত্ব দিতে চেয়েছেন—তবে তার মৌলসূত্র ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের জন্য নতুন অভিজ্ঞানের আশ্রয়-সন্ধান, রণক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বগামী-দৃষ্টিতে সকল কালের ঘটনা দুঃসময়, হত্যাপাপ ও মৃত্যুর ক্রিয়াকে একটি ট্র্যাজিক বোধের পরিকেন্দ্রে বুঝবার প্রয়াস থেকেই সঞ্চারিত হ জীবনের প্রতি উক্ত দায়িত্ববোধ, অঙ্গীকার-পোষণের অনুজ্ঞা। কারণ, ইতোমধ্যেই যেহেতু ব্যক্তির কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান-সমাজ-পরিবার থেকে, ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার স্বজন-প্রতিবেশীর সাযুজ্য থেকে, সেহেতু নতুন সাহমর্ম-রচনার প্রকল্প তাঁকে অন্বেষণ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সর্বতোঅর্থেই মানবসম্বন্ধের ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছিল—যতোটা প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করেনি। তখনও ব্যক্তি তার চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র একেবারে ছিন্ন করে বসেনি। লরেন্সের উপন্যাসে তাই লক্ষ করা যায়—সবশেষেও অবশিষ্ট থাকে মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের রেশ। কিন্তু দ্বিতীয়

মহাসমর ব্যক্তিকে করেছে ছায়াবৎ—সে যেন ক্রমে নিষ্প্রদীপ-পটে ছায়াময় হয়ে যাচ্ছে এবং শেষত, গণ্ডারের জান্তবতায় পর্যবসিত। তবে ব্যক্তির নিরবলম্ব এই অবস্থানকে আবার স্বস্থানে পুনর্বাসিত করার প্রজ্ঞা নিয়েই শিল্পী ব্যক্তির চৈতন্যে সারাৎসারকে অনঘ-মহিমায় ফিরিয়ে আনেন। এ-প্রয়াসে তিনি সকল অপশক্তির তাণ্ডবের বিরুদ্ধে মানব চৈতন্যের অমোঘ অস্তিত্ব মেনে নিয়ে দার্শনিক প্রতিজ্ঞার প্রতিই অনন্যমনস্ক হয়ে ওঠেন। যদিও আধুনিক ব্যক্তি তার প্রান্তিক অভিজ্ঞতায় জীবনমৃত্যুর জিজ্ঞাসায় উত্তরবিহীন থাকে,——কোন বৈধ-উত্তরই সে পায় না, তবু, ও বিশ্বমানবতার উদ্দেশ্যহীন অবস্থান সম্পর্কে অবশ্যই তাঁর জিজ্ঞাসাটি থাকে অনভিভূত। এও এক জাতীয় আধ্যাত্মিক-যন্ত্রণাতুল্য জিজ্ঞাসা—অথচ মূলত অর্থে বিশ্বাসের অখণ্ড রূপ থেকে ভ্রষ্ট। আয়েনেস্কোর যুদ্ধাভিজ্ঞতা তাঁর দর্শনকে উদ্বুদ্ধ করেছে—বন্দী সময়কালে তিনি রচনা করেছেন 'সিসিফাসের মিথ' (১৯৪২) এবং কার্যত জীবনদর্শনের প্রতিজ্ঞায় বাস্তবদৃশ্য থেকে অভিগমন করেন অবলোকনের কাঠামোর মধ্যে। ১৯৪৭ সালের পরে যুদ্ধ যখন অবসিত এবং ফ্রান্স মুক্ত—সেই পরিবেশে বসে রূপক রচনার আড়ালে এই শিল্পী "দি প্লেগ' (১৯৪৭) উপন্যাসে সার্বজনীন জীবনের প্রতিমান ব্যক্ত করেন। মৃত্যুরোধে ব্যক্তির একক দায়িত্বের প্রবলতা ও যন্ত্রণার বিশালকায় অবলোকনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ঘটনা হয়ে ওঠে পরাদৃষ্টির বৈভব যুক্ত।

সর্ববিধ ভাঙনের প্রতিবেশ থেকে প্রতিরোধের আয়ুধ সন্ধান করেছেন সার্ত্রে ও—প্রতিষ্ঠান-বিকেন্দ্রিক মানুষের স্বয়ম্ভর চিন্তায় তার পাপ, দায়িত্ব ও স্বাধীনতার তন্বিষ্ট রূপটি তিনি অনুধাবন করতে চাইলেন। যুদ্ধে আত্মবিসর্জনের মহত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার যেমন ভেঙ্গেছে, সে-সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে মানুষের কর্ম-উদ্যোগ সম্পর্কে পূর্বতন বিধানসমূহও। আত্মোৎসর্গের মূল্য বোধ সম্পর্কে তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে বারংবার পীড়িত হয় এলিয়টের নাট্যজগতের পাত্রপাত্রি—পাপবোধের যন্ত্রণার পাশে মূল্যবোধটিকে লেখক বিপ্রতীপ মাত্রায় দাঁড় করান। এভাবেই ভেঙ্গে-পড়া ব্যক্তির মনোজগৎকে চিন্তাশক্তির মধ্যে পুনঃপ্রত্যাবর্তন ও স্বস্থ করবার মনস্কামনাই ছড়িয়ে আছে যুদ্ধ-পরবর্তী শিল্পসাহিত্যের রূপকল্পে। সার্বিকভাবে পাপাচার অশুভত্বের পাশাপাশি নৈতিকতার পরিশুদ্ধির জিজ্ঞাসাও ছিল অনমনীয়। ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারজয়ী ইংল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক উইলিয়ম গোল্ডিং তাঁর উপন্যাসে যুদ্ধ-প্রসঙ্গকে অশুভরূপে প্রতিভাসিত করেন, শেষত নৈতিক প্রতিরোধের

অনুশীলন-লক্ষে স্থিরীকৃত থাকেন। সাহসী অথচ দুর্বল-ব্যক্তির এই দ্বৈতত্ত্বের গর্ভেই তাঁর নিরীক্ষা চলে—সমাজরাষ্ট্র যেহেতু ব্যক্তির সম্মতি নেয়না যুদ্ধকালে, তাই তিনিও অথরিটিযুক্ত ব্যক্তিকেই অনুশীলিত করেন প্রতিরোধের আত্মভিতে তথা নৈতিকতায়। তাঁর Lord of the Flics (১৯৫৪) এবং প্রায় সব কয়টি উপন্যাসেই উক্ত অশুভ ও নীতিবত্তার পরিচর্যা পরম্পরাটি অনুধাবন করা যাবে। বোঝা যায়, কেন ও কিভাবে এককত্বের মধ্যে গৌরবসন্ধান পরিহার করে একাকীত্বের দুঃসহ প্রবলতায় উপন্যাস-নাট্যের চরিত্রবর্গ কিম্ভূতরূপ ধারণ করে, ব্যাপক ধ্বংস আর পাপবোধের উৎক্রান্তির মধ্যে—যুদ্ধ যেখানে সবই ধ্বংস করেছে শুধু নয়, মানুষের নিজের মধ্যেও ইতোমধ্যে ধ্বস এমেছে এবং সে হারিয়েছে তার সাযুজ্যরক্ষার ক্ষমতাকেও। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেন্সে আত্মগোপনকারী ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম-এষণার মধ্যে নিজের নিঃসহায় পরাধীনতা-কেই প্রত্যক্ষ করে, অনুভব শূন্যতায় বিমথিত হয়, নিজের বাঁচাকে এভাবে অবলোকন করে—

> জীবিত, বেঁচে আছে, তবু সে প্রাণশক্তিহীন অতিমাত্রায়
> মুমূর্ষ, মরতে চলেছে, তবু মনেই হয়না সে মরণশীল,
> ব্যথিত নয়—গর্বিত নয়,
> অনুসন্ধিৎসু নয় আদৌ। ('অনুভব শূন্যতা' কবিতা, উইলফ্রেড ওয়েন, অনুবাদক, অশোক রাহা।)

অনুরূপ প্রশ্ন ঔপনিবেশিক জাতির শিল্পীর চিন্তায় প্রায়শ অধরাই থাকে। কারণ এখানে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্নতর—তাই 'অশনি সংকেতের' ব্যক্তিবর্গ জানেই না কোন পাপে তারা অন্নহীন হয়ে যাচ্ছে, কোথায় বা বেঁধেছে যুদ্ধ। না খেয়ে মানুষের মৃত্যু হতে পারে—এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও তারা অবিশ্বাসে-অসাড়তায় নিমগ্ন থাকে। তবুও পরিস্থিতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক জাতীয় সাযুজ্যবন্ধনের গোপন কলাকৌশল—যা দিয়ে তারা মোকাবেলা করছে দুঃসময়ের রাহুগ্রাসকে। য়ুরোপের নাট্যে-উপন্যাসে-গল্পে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সাযুজ্য-গড়ার প্রতিজ্ঞা জেগেছে নতুন করে—যা ক্ষতবিক্ষত জীবনরূপের অন্তঃশরীর থেকেই উৎক্রান্ত ; এবং সেহেতু কৌণি-কতায়—বক্রতায় বিপথু। ব্যক্তি তার পার্শ্বস্থ মানুষের সঙ্গে স্বীয়-বৈষম্যকে প্রকট করার মধ্য দিয়ে সেই বৈষম্যের পৃষ্ঠপটেই আত্মপরিচয়কে

মুদ্রিত করতে থাকে। আয়েনেস্কো বেকেটের এ্যবসার্ডনন্দনতত্ত্ব তারই ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যক্তির বিপ্রতীপ অবস্থানে অন্য সব ব্যক্তির অস্তিত্বের কেন্দ্রিত আয়তন নির্মাণসূত্রে এই শিল্পচিন্তায় সামীপ্য রচনার অভি-প্রায়ই ব্যক্ত হতে থাকে, যাকে স্বয়ং আয়েনোস্কো বলেন Confrontation৯—যুদ্ধাঙ্গনের রণকৌশলের মতই জীবনের সঙ্গে অসদ্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকা-রান্তরে সদ্ভাবকে বৈধ করা। কারণ চিরপরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে চেনা শোনার পালা ক্রমেই কঠিনতর, অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যক্তির সঙ্গে পার্শ্বস্থ মানুষের প্রাণিক-বিনিময়ের হৃত-সাযুজ্য অন্বেষণকল্পেই বস্তু-জগতের অসঙ্গতি, আপাতবিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ দিয়েই ধরতে হচ্ছে সেই ক্রমবিনাশের হেতুকে এবং সেই সূত্রে সমগ্রতাকে। 'অশনি-সংকেতে' অনঙ্গ বৌ আর গঙ্গাচরণ যেখানে আরও বেশি মানবসম্বন্ধের গভীরতায় আপ্লুত হতে থাকে, তাদের কর্মযজ্ঞ ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়ে যুদ্ধের সংঘটনা-সম্ভাবনা নির্ধারিত হয়না, নিয়ন্ত্রিতও হয় না—এমনকি তাদের চেতনায় অপ্রত্যক্ষ থাকে যুদ্ধের পরিকেন্দ্রটি। তাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ কোন প্রান্তিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেনা—যেমনটি লক্ষণীয় য়ুরোপের সমাজে। তারা সেখানে ট্র্যাজিক জীবনবোধের অভিক্ষেপে সর্বার্থেই নিরালম্ব, উত্তরবিহীন; চেতনার উদ্দীপ্ত-স্তরে ঘটনা ও বস্তুর তাৎপর্য মূল্যবোধের উদ্ভা-সনে মহামুহূর্ত রচনার কাঠামো থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই সার্বজনীন যন্ত্রণা-বোধের পটভূমে আত্মদর্শনের সূত্রই অবলম্বিত হয় এবং অথরিটির অশুভ মারাত্মক পরিণামটিকে চিহ্নিত করা হয়——দ্রষ্টব্য 'গণ্ডার' (১৯৫৯) নাটকটি বেকেটও 'গডোর প্রতিক্ষায়' (১৯৫৩) মানব-প্রজাতির হতাশা, শূন্যতা; অন্তহীন ক্লান্তিকে—কালিক অভিজ্ঞতার ছিন্নবিচ্ছিন্ন উপাদানকে দৈশিক (Spatial) রূপকল্পে বিধৃত করেন এবং অনৃত আশা আর প্রতিক্ষার প্রপঞ্চ ভেঙ্গে ফেলেন। তাঁর ধারণাজগতে ব্যক্ত হয় বিশ্বের সেই অনস্বর-রূপটি—যেখানে চিরকালের মত অসম্ভব হয়ে গেছে, অবাস্তব হয়ে গেছে সমঝোতার সকল অন্বিসন্ধি। অন্যায়কে-আধিপত্যবাদকে এবং আধিপত্য মেনে নেওয়ার গুপ্ত অনুমোদন ও সমর্থন—এসবের অন্তরালস্থিত বৈধতার ন্যায়কে এক অর্থে তিনি জিজ্ঞাস্য করে তুলতে চেয়েছেন। এর পশ্চাতে তাঁর অভিনিবেশ থাকে—মানুষ কি হয়েছে সেইসব অন্যায় আর আধিপত্যের ফলে—তারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা। ঐতিহাসিক সূত্রেই তাঁর শিল্পে অতএব বিসর্জিত হয়েছে প্রচলিত রূপের প্রতিমান। শিল্পধৃত উপাদানগুলোর

বিরোধপূর্ণ-সহবস্থান মূলগত অর্থেই বহু আগে অভিগ্রস্ত-প্রায়, হেতু ও কাল-ক্রমে বিন্যাসও বদলে গেছে দৈশিক-আততির বিভাজনে—তাই পুরোন অভিযোজন, আকস্মিকতার মহান-উদ্ভাস, বস্তু-চৈতন্যের নির্বিঘ্ন-সমীকরণ দিয়ে আদি-মধ্য-অন্তের কেন্দ্রাভিগ শিল্পবিশ্ব গড়বার অভিধাও গেছে পাল্টে। যুদ্ধশেষে বেঁচে-থাকা-মানুষগুলোর উদ্বেগ আর তার মধ্যেই টিকে থাকার ক্লান্তিময় ঔদাসিন্য, দিনানুদিন জীবনযাপনের অনাসক্ত-বাধ্যতা—এসব অনবস্থাই শিল্পকে উন্মাথিত করছে প্রবলভাবে।

তবে শিল্পী প্রতিমানকে যেমন ভাঙেন, নিরর্থক করেন, তেমনি সেখানে নতুন নান্দনিক-আয়তন গড়েও তোলেন—হয়তো স্থাপন করেন নতুন অনুকল্প, অথবা উল্টোভাবে ঘুরিয়ে দেন পুরোন-প্রতিমানের মুখ। কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বরচিত নিজ নিজ অনুষঙ্গের অন্বয়-রেখা ভেঙ্গে রূপান্তর ঘটান প্রমিতির। বাস্তব-জগৎ ক্রমাগতই মানুষের চৈতন্যে রূপের শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, বিশ্ববিধানের স্থিতিকে করছে অনিশ্চিত,—কিন্তু একজন শিল্পীর আশ্রয় হচ্ছে, তাঁর রূপরচনার যুক্তি শৃঙ্খলাকে অক্ষুন্ন রাখা, তাঁর চারপাশের উপাদানের বিপ্রতীপ সম্পর্কের মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করা—কারণ মানুষ এবং বিশেষ করে শিল্পী শেষ পর্যন্ত বোধসম্পন্ন থাকেন। তাঁর চেতনাই সার-সত্তারূপে শিল্পজগৎকে অস্তিত্ব দেয়। সে-সূত্রে বাস্তবের দুয়ার বারংবার খুলতেই হয়, বারংবার পরিবর্তিত বাস্তবের প্রতি, মানবিক জাগতিক প্রতিবেশের প্রতি তাঁর শুদ্ধ অবধান, সেই অবধানের চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার দুঃসময়-দুঃখকেও বহন করতে হয়। দান্তের 'ইনফার্নোর' মতই বাস্তবের বিকৃতি দর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত এ্যবসার্ড-দৃষ্টিকোণ তাই নেতিবাচক একটি প্রণালীও বটে—আয়েনেস্কোর কথায় এণ্টি-প্লে' (anti-play), যেখানে ব্রেশট বিভঙ্গ-বাস্তবকে কালিক অভিজ্ঞতার বৈপ্লবিকতার মধ্যে রূপায়িত করে জীবনকে এপিক থিয়েটারের প্রকল্পে নিয়ে গেছেন।

খ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়পট : শিল্পসাহিত্যের অভিযাত্রা, দিকবদল

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, যুদ্ধসময়ে লেখকশিল্পীর প্রতিরোধমূলক অবস্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংঘ গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষে এ সংঘ একটি ব্যাপক শাখারূপ ধারণ করে এবং যুদ্ধবিরোধী চেতনার সঙ্গে শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির অনোন্যনির্ভর-সম্পর্ক তৈরী করতে থাকে। গান-কবিতা-নাট্য-কথাশিল্প-চিত্রকলায় যুদ্ধের সময়পট সংক্ষুব্ধ

হয়ে ওঠে স্বাদেশিক রাজনীতির ইতিনেতি-সংঘাতে—তবে প্রতিরোধস্পৃহায় প্রদীপ্ত। এসবের পরিমণ্ডলে নব্যসৃষ্টির প্রবাহ শতমুখী হয়ে সাহিত্য শিল্পে অনেক বাদী-প্রতিবাদীর মিলনদৌত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের অভিঘাত—অঙ্গীকারকেই মুখ্য ভূমিকা দিতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সাপেক্ষতায় জেগেছিল ঔপনিবেশিক পরাধীন বাংলার বিপ্লব-স্বপ্ন। আবেগমাত্রায় স্বদেশচেতনার উৎসারণকে রাজনীতির মধ্যে অঙ্গীভূত করার প্রয়াসও হচ্ছিল। বিশ শতকের দুই তিন দশকের দিকে সে স্বপ্ন ক্রমেই ভাঙতে থাকে দাঙ্গা আর রাজনৈতিক দলগুলোর বিভ্রান্তির সূত্রে, আবেগের রূপমূর্তি ক্রমেই চারিত্র্যবদল করে গণ-অভ্যুত্থানের টানা-পোড়েনে সংশ্লিষ্ট হতে থাকে। এ-অবস্থায় ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার নেতৃত্বকে বৃত্তকেন্দ্র থেকে চ্যুত হতে দেখে। '৪২ থেকে '৪৭ এর মধ্যে যুদ্ধসময় তার বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষের করালরূপ (এ-দুর্ভিক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলায় গণহত্যার ফ্রন্ট হিসেবেই ছিল—নাৎসিবন্দী শিবিরের মত) এবং অন্যদিকে ঘনায়মান গণবিক্ষোভ,-প্রতিরোধের তরঙ্গমালায় নড়বড়ে হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের চিন্তাজগৎ; তার মূল্যবোধের ললিত-কর্ষিত দৃকটিতে দেখা দেয় আন্তঃবিশৃঙ্খলা।

শিল্পসাহিত্যে যুদ্ধ বীক্ষণাগার হিসেবে জীবন ও সমাজে পরীক্ষার একটি সময়-সন্ধি সৃষ্টি করে, তাকে অণুপরমাণুর মধ্যে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে, তবুও দুর্মর-জীবন উপপ্লব-সংকট সত্ত্বেও অস্তিত্বের শক্তিতে অজেয় থাকতে চায় এবং ব্যক্তি আত্মভূত, নিঃসহায় হয়েও দুঃসময়কে মোকাবেলা করে। উক্ত কালে শিল্পী আবেগ-অনুভূতি এবং জাগতিক-প্রতিবেশকে অলঙ্ঘ্য-রূপদানে দৃঢ় থাকেন। হিংসা-উন্মত্ততার মধ্য থেকে উদ্ভিন্ন-মানবতার সংরক্ষণে শিল্পী সংকল্পবদ্ধ হন, রবীন্দ্রনাথও এই-মানবতার আবাহনকে নব্যসৃষ্টির যুক্তি-সূত্রে গ্রন্থিত করতে চেয়েছিলেন—'বিশ্বের অমোঘ শান্তির' সমর্থনে।

প্রতিরোধকামী শিল্পীর আত্মপ্রকাশে সক্রিয়তার মাত্রা বাড়ে, এক ধরনের মহাব্রত পালনাজ্ঞায় যেন তাঁর উদ্যম থাকে বশীভূত এবং সে-মহাব্রতের সঙ্গে ঐকতায় যুক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন মঞ্চের লেখক, সংঘ-প্রতিষ্ঠান এমন কি রাজনৈতিক দলগুলোও। ব্যক্তি কবির আত্মনিভৃতিলোকে জগচ্চিত্রের যে-প্রদক্ষিণ পূর্বাপর থাকে, তা হয়ে যায় বহির্বৃত; তখনকার সম্মিলিত সৃষ্টিক্রিয়ার আবহমণ্ডল তাঁর রচনাকে বিবর্ধিত করে। সমবেতভাবে যেহেতু

সকল শিল্পীই মানবতার স্বপক্ষে উচ্চকণ্ঠ; যুদ্ধগ্রস্ত একটি মানবগোষ্টি যেন ঐ উচ্চারণে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে, শিল্প ও জীবন পরস্পরাগত সূত্র পায়। নিছক একজন ব্যক্তি হয়তো ঘটনার ব্যাপ্তি, বহুমাত্রা ও অন্তঃরূপকে ধরতে পারেন না, কিন্তু যৌথত্বে তিনি একাত্মক থাকেন বলে ব্যাপকতার অবতল-দর্শন সম্ভবপর হয়—সম্মিলিত তরঙ্গ-শক্তির সমপ্রবাহে তাঁর চল-মানতা বিতত হয়ে ওঠে। শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যাভিমানবোধ প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সীমাবদ্ধতা যুদ্ধের অস্থির সময় ভেঙ্গে দেয়—এটা পরিস্থিতিরই অন্তর্মুখী চাপ এবং একই আবেগের মধ্যে নির্গলিত ও স্নাত হওয়ার নৈর্ব্যক্তিক প্রণোদনা। মূলত, যুদ্ধ একটি আতঙ্ক, হতাশা, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিরোধের অনুষঙ্গ—যার শেষ অভিধা শান্তির দ্যোতনা। ফলে অস্তির দিকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অভিযাত্রিক হয়—যুদ্ধপাপ-সংক্রান্তির মধ্যে য়ুরোপের মত ঘুরপাক খায়না, সে পায় তার স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে আপন হাতের মুঠোয়—সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তিলাভের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে।

উপরি-উক্ত সমবেত-সৃষ্টির অজস্র সম্ভার ছড়িয়ে আছে, যার কিছু উদাহরণ লক্ষণীয়—'প্রাচীর' কাব্যসংকলন (মে, ১৯৪২) 'জনযুদ্ধের গান' '(জুলাই ১৯৪২), 'একসূত্রে' (ডিসেম্বর ১৯৪২), 'নবজীবনের গান' (১৯৪৫) ইত্যাদি।[১০] এসব-প্রয়াসের নেপথ্য-উৎসাহ জেগেছিল তৎকালীন লোকসংস্কৃতির ধারাকে নানাবিধ যুদ্ধবিরোধী-সম্মেলনের মঞ্চে টেনে আনার মধ্য দিয়ে। প্রাণিধান যোগ্য যে, ইজমনির্ভর রীতিচর্চার আত্মভূত-আয়তন থেকে যুদ্ধকালীন শিল্পরচনার পার্থক্যটা গুণগত। যে-কারণে তিরিশের শেষার্ধে কবিতায়-উপন্যাসে যে নগরভিত্তিক ঘূর্ণাবর্ত ছিল—তৎকালীন গণ-অভ্যুত্থানের প্রসবণ ও বাহ্যত ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের উদ্দীপনায় নগরমুখী সংস্কৃতির সেই প্রাধান্যকে অতিক্রম করে গেছে চল্লিশ দশকের জনসংস্কৃতির প্রবাহমালা।—১৯৪১ সালের ২২ শে জুন রাশিয়া আক্রান্ত হবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যেভাবে জনযুদ্ধের চারিত্র্য অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলবীজটি ছিল পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতার সংকট-দ্বন্দ্বে, রূপ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধমূর্তিতে। সাম্রাজ্যলিপ্সু দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সঙ্গে উপনিবেশিক দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বজটিল সম্পর্কের অনুপাত এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতি পায়। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ধাপে তৎকালীন রাজনীতিতে এই যুদ্ধকে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণে

বিবেচনার প্রয়াস চলে এবং ইতিবাচক মাত্রায় তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিশেষত বামপন্থী সংগঠনগুলো। এরই প্রভাব পড়ে সংস্কৃতির জগতে, নানা রকম সম্মেলন-অনুষ্ঠানাদির আয়োজন একদিকে যুদ্ধবিরোধী চেতনাকে অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির ক্ষীণ ধারাকে প্রবলতা দিতে উৎসুক হয়। শহুরে সংস্কৃতির বদ্ধ জলাশয়ে সেই ক্ষীণধারার সংযোগ মূলধারাটিকে একটি বৃহৎ ধারার অভীপ্সু করে তোলে। বাংলার লোকগোষ্ঠির বিচিত্র অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত সাঙ্গীতিক আঙ্গিককে, জনশ্রেণীর গভীরে প্রোথিত দেশজচেতনার প্রতিবাদী রূপটিকে নিষ্কাশনের চেষ্টা চলে। প্রসঙ্গত, লক্ষণীয় যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনসম্পৃক্ত তৎকালীন স্বাদেশিক চৈতন্যের আবহ থেকে এই লোকজ চেতনার অনুষঙ্গ অন্যতর, আগের আবেগমথিত ভাবাত্মক স্বদেশচেতনার নিছক রাখিবন্ধন ও প্রত্নচর্যা এখন বলিষ্ঠতায়, বাস্তবনিরিখে দেশপ্রেমের বহমান সংগ্রাম চেতনার সঙ্গে বিজড়িত হল। প্রত্যক্ষত, ফ্যাসিজমকে রুখবার দুর্জয় সংকল্প তাতে উচ্ছ্রুত হল, কিন্তু অন্তরালে বিধৃত হল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ আর শ্রমজীবীর আবহমান জীবনের অভিনব ব্রতকথা। তৎকালীন মধ্যবিত্ত নাগরিক কবি এভাবেই বহমান দেশজসত্তার মূলে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক চিন্তার অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। তিরিশের অন্যতম কবি বিষ্ণুদের 'বাইশে জুনে' (১৯৪২), 'সাত ভাই চম্পা'য় (১৯৪৫) লোকজপ্রতিমার শিকড়ে আন্তর্জাতিকবোধের পুষ্পিত বিকাশ ঘটেছে। অনেক কবির মনোবিশ্বেই দেশাত্মবোধে অর্পিত হয়েছে আত্মসত্তার আর্কেটাইপ—ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, অন্তর্মূল-সঞ্চারণশীলতায় এবং স্বনির্বাচনের দায়িত্ববোধে। স্মৃতিসংরক্ত শব্দানুষঙ্গে সময়-স্বদেশচেতনার উৎসে ঈস্পাতদৃঢ় সহিষ্ণু প্রতিরোধের প্রার্থনা কিভাবে দুর্মর হয়ে উঠতে পারে, তার উদাহরণ পাওয়া যাবে বিষ্ণুদের 'জল দাও', সুধীন্দ্রনাথের '১৯৪৫', অমিয় চক্রবর্তীর 'প্রবাসী', জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' ইত্যাদিসহ আরও কবিতা, সময়সংক্রান্তির পাদমূলে দাঁড়িয়ে কবি প্রবন্ধাকারে লিখে ফেলেন তাঁর অনমনীয় প্রতিবাদের বক্তব্য, যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' শীর্ষক উচ্চকিত, উৎকণ্ঠ প্রতিবাদ, আবার সভ্যতার বিপর্যয় দেখে কোন কবি বিরুদ্ধ বাদী মাত্রায় অনুশাসনবদ্ধ হয়ে উঠেন, যেমন ফররুখ আহমদের কবিতা। 'লাশ' কবিতার অন্তর্বেদনা ও উদ্বেজক-রূপটাই তাঁর চৈতন্যে ধৃত থাকে—যা পরবর্তী পাকিস্তানোত্তর-প্রতিবেশের স্বপ্নভুবনেও জেগে থাকে অঙ্কুশের মত। কবি সর্বতোভাবেই জড়সভ্যতার বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক পাপের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন।

অনুরূপ দিকবদল লক্ষণীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রেও। তৎকালীন সময়ে বাংলা চিত্রকলায় অনুসৃত হতো বৃটিশ আর্ট স্কুলের রীতি বা প্রাচ্যচিত্রকলার অনুবর্তন —এর মধ্যেই লোকজকলার অনুষঙ্গ সঞ্চারিত করেন যামিনী রায়। যুদ্ধ-প্রসঙ্গ চিত্রকলাকে দৈশিক-মাত্রায় বাস্তবধৃত করেছে বা বলা চলে পরি-পার্শ্বের বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ গড়েছে—জীবনধ্বংসের কালোরূপের স্মারকচিহ্ন হিসাবে শিল্পময়ত্ব লাভ করে তার উদাহরণ ১৯৪৩-৪৪-এ জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক স্কেচগুলো। সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়ে আঁকলেন চিত্তপ্রসাদ, মনি রায়, সোমনাথ হোড় এবং আরও কেউ কেউ। শান্তি ও যুদ্ধবিরোধী মতবাদ থেকে চিত্তপ্রসাদ শিশুর রূপকল্প চয়ন করে আঁকেন "যুদ্ধবিরোধী চিত্রকলা,' এমনকি নন্দলাল বসুও পৌরাণিক শিবদুর্গার প্রচলপ্রতীকে যুদ্ধের করালমূর্তি অঙ্কনে অন্তর্বৃত হয়ে উঠেন।

কথাশিল্পে লক্ষণীয়, যারা ছিলেন কল্লোলীয় ঔজ্জ্বল্যে পরিস্নাত—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মভাবনা এবং বাস্তববোধের নামান্তরে রোমাণ্টিকতায় বিলোড়িত, মনোলৌকিক চিন্তাপ্রবাহের সূত্রে ভাবলৌকিকতায় পরিভ্রমণ-শীল, তারা এই সময়কালের পরাভবে যেন বিপর্যস্ত-প্রায়। উপন্যাস—পটের বিস্তৃত ক্যানভাসে ব্যক্তিময়তার একান্ত-নির্বাচিত ভিত্তিটি যেন শুধুই আর হৃদয়প্রবলতায় আত্মস্থ থাকতে পারছেনা। অচিন্ত্যকুমার—বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-প্রবোধকুমার-শৈলজানন্দ—এদের বোহেমিয়ান, স্বপ্নদর্শী, আত্মপ্রীড়িত মধ্যবিত্ত যুবকরা ক্রমশঃই অন্তরালবর্তী হতে থাকে আর উপন্যাসের পটভূমি বাস্তবের তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায়, কালসীমার প্রত্যাঘাতে অন্তর্বয়নের নিটোল রূপটি হারাতে থাকে। শিল্পীর মনোজগতে যুদ্ধজীবনের উপাদান ছোটগল্পের মিতপরিসরে ঘনবদ্ধ, তীব্র নিখাদঝংকৃত যতোখানি হয়েছে, ততোটা উপন্যাসে ঘটেনি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে যুদ্ধ-পরবর্তী দৃষ্টিকোণে পরিচর্যাধৃত অস্তিত্ববাদ দেশজ প্রতিবেশ পেয়েছে বটে, কিন্তু 'নয়নচারা' বা 'মৃত্যুযাত্রা' গল্পে তিনি যুদ্ধযুগের মুহূর্তকে উচ্চকিত-রূপ দিতে পেরেছিলেন সার্থকভাবে। তেমনি প্রবোধকুমার সান্যাল লিখলেন 'অঙ্গার' গল্প—যেখানে নিষ্প্রদীপ রাতে ব্যক্তির অনেক কিছু হারানোর সর্বগ্রাসী চেহারা ফুটেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন কাঠখড়, কেরোসিনের গল্প, তারাশঙ্কর রচনা করলেন মরামাটি, বোবাকান্না, অহেতুক ইত্যাদি।[১১]

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-চর্চা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দর্পন' রচনা করে বিবেকী শিল্পীচেতনার উর্তন ঘটান মার্কসবাদী মানবতায়, পরপর রচিত হয় 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস—১৯৪১-৪৬—এর দুর্বৃত্ত সময়ের অপরাধচিহ্ন আর বিকৃতির অন্ধিসন্ধির উন্মোচনে অধীর। সপ্রতিভ সাহসিকতা আর ঈস্পাততুল্য মনোভাবে যুদ্ধ ও আকালের যে-সব গল্প তিনি লিখেছেন —যেমন আজ কাল পরশুর গল্পসমূহ কিংবা 'পরিস্থিতি'—সেখানে কল্লোলীয় বাস্তবতার চোরাবালি থেকে তিনি বাংলা কথাশিল্পের বাস্তবতাকে কৌণিক পন্থায় সোরকেন্দ্রে নিয়ে আসেন এবং বহু ব্যক্তির বিশৃঙ্খলসমবায়ে মানব-প্রজাতির অস্তিত্বের শিকড়সন্ধান, মানবতার উদ্‌ঘাটন করতে থাকেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। যুদ্ধের সময়পট এই-রূপান্তর ও বিশ্লেষণের অনপেক্ষ-রূপকে তৈরী করেছে—যেখানে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ যুক্তিটাই স্বরূপে বজায় গেছে। শোষণ-পটকে মৃত্যুর অনবচ্ছেদ-সর্বগ্রাসের মধ্যে তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে সে-যুক্তির নববিধান ঘটিয়েছেন, যেখানে মানুষের অসহায় একাকীত্ব সত্ত্বেও তাঁর বাঁচবার ইচ্ছাটা থাকে অবিচল, একরোখা, মরিয়া। বিমল কর তাঁর যুদ্ধ-সময় ভিত্তিক উপন্যাস 'দেওয়াল'-এর ত্রয়ীপর্বের বিভাজনে দুঃসময়ের প্রবল অভিভবের কাছে নিম্নমধ্যবিত্তের পরাজয়কে যেমন আঁকেন, তেমনি বেঁচে থাকার আদিম প্রবণতাকেও—"আমাদের এই সময়টাই বোধহয় এই রকম। সবাই ভাঙা, সকলেরই সমান অবস্থা, টুকরো হয়ে আমরা আছি, নিটোল পুতুল কেউ-নই। হয়ত তাই দুই অন্ধ খোঁড়া মিলে থাকতে হবে আমাদের।" ('দেওয়াল'. পরিচ্ছেদ ২৮)।

অন্য-সময় এ-ইচ্ছায় নানা মতাদর্শের ছায়াসম্পাত থাকে, কিন্তু, দ্বিতীয় মহাসমরের অভিঘাতমথিত পরিবেশে পরাক্রান্ত সময়পটে শিল্পীর প্রধান আয়ুধ নিছক মানবতাবোধকে অবলম্বন করা—প্রচল ধর্মবোধের মানবতা নয় তাত্ত্বিক-মানবতা নয়—সার্বিক অধঃপতনের মধ্যে, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রতিবেশে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবার মানবতা। কখনও বা তা আবার নিজেকেই টিকিয়ে রাখবার আদিম প্রবণতা রূপে নীতিহীন কার্য-কলাপে নিক্ষিপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এই মানবতাকেই চতুর্মুখী লক্ষভেদে অবতীর্ণ হতে দেখি সংগ্রামের বধ্যভূমে; যে অবতরণ ভয়াবহ, ক্রূর কিন্তু আপোষহীন।

উপন্যাসে-ছোটগল্পে পূর্বতন-সম্পর্কের ভাঙন দ্রুততর হল বটে, একই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের নব্যচেহারাও স্ফুট হতে থাকে। যুদ্ধ-পরবর্তী

উপন্যাসে বিশেষভাবে জেগে উঠে ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিসম্বন্ধের সঙ্গে লেখকের মানসিক বিরোধ, দূরত্ব—তাঁকে অনিবার্যত বদলে নিতে হচ্ছিল বাস্তবতার বোধ সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণাকে, পাত্রপাত্রির জীবন ও আয়তন বদলের সত্যতাকেও স্বীকার করতে হচ্ছিল। আত্মমুখী নায়ককেন্দ্রিক উপন্যাস রচয়িতার বেলায় এটি সংকটের সূত্রপাত ঘটায়—যার ফলশ্রুতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। উপন্যাসের আধেয় যেহেতু ব্যক্তি-মানুষ—ইতিহাস-সময়ধৃত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণই তাঁর মৌলিক অভিপ্রায় রূপে সক্রিয় থাকে। যুদ্ধও উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কিত বোধ হিসেবেই গৃহীত হয়ে থাকে। এর ফলে কোন শিল্পী ব্যক্তিকে তাঁর সমকালে তথা ঐ আশ্লেষ-পটে হয়তো পূর্ণায়তরূপে খুঁজে পাননা, আবার কোন কোন শিল্পীর মানসনেত্রে বীভৎসরূপের ছবিটি আগেই বিধৃত হয়ে থাকে। স্তাদাল নেপোলিয়নের সঙ্গে রাশিয়া-অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু লেখেননি কোন যুদ্ধোপন্যাস—যা রচিত হল স্তাদালের মৃত্যুর চব্বিশ বছর পর টলস্টয়ের হাতে। দ্বিতীয় মহাসমরের পনের বছর আগেই টমাস মান যুদ্ধ-রূপের ক্ষয়-নৈরাজ্যের প্রতিচ্ছবি আঁকেন 'ম্যাজিক মাউন্টেন' (১৯২৪)-এ, আর ঘটনা যখন ঘটছে তখন রচনা করেন 'জোসেফ এ্যণ্ড হিজ ব্রাদার্স' -এর রূপক-আখ্যান। রচয়িতা প্রলয়কালে সর্বদাই বাস্তববিদ্ধ ব্যক্তিকে ঘটনাসমেত যথাযথ অবস্থায় নাও পেতে পারেন।

তৃতীয় বিশ্বে—বাংলাদেশে যুদ্ধ, মন্বন্তর ও দাঙ্গার উন্মত্ত কালসীমায় একজন ব্যক্তির অসহায়ত্ব বেদনাময় আত্মরক্ষার করুণ লড়াইকে মহত্ত্ব ও সার্বজনীনতার মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণের দৃষ্টিবৈভব অর্জন করেন না। কারণ মৃত্যুপরিবৃত প্রতিবেশে অস্তিত্বের লড়াই একদিকে থাকে না-খেয়ে মরার ঘটনাচিত্রে, অন্যদিকে এ লড়াই আমাদের 'লোকায়ত নানা ধারণা ও ব্যাখ্যানে'[১২] হাজার বছরের পুরোন-প্রসঙ্গ। এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' যে-অস্তিত্ববাদের জিজ্ঞাসা; তাও সার্ত্রের দর্শন ব্যাখ্যার পূর্ববর্তীকালেই উন্মোচিত হয়ে গেছে। কাজেই ক্ষুধা নামক আদিম জৈবসংগ্রাম আর মৃত্যুযাত্রার রূপকল্প দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিভাবনার অনেকখানি অংশের গঠন পূর্বাপর ও অব্যবহিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তা আরও উৎকট রূপে, সচেতনতায় বিক্ষুব্ধ ও অপ্রতিরোধ্য করেছে মাত্র। এ-প্রসঙ্গে ইঙ্গিতময় রচনা হচ্ছে 'অশনি সংকেত'। বিভূতিভূষণের অপুকেন্দ্রিক জীবন-ভাবনার পূর্বজ্যামিতি এখানে অনঙ্গ বৌয়ের মধ্য দিয়ে কেমনভাবে বাস্তবতায়

অপরাজেয় হয়েই মূর্ত হয়, তারই সরলরেখ আখ্যান রচিত হয়েছে। সর্ববিধ ক্ষয় আর সংশয়ের সময়ে বাস করেও প্রকৃতি-প্রতিবেশের সঙ্গে হারিয়ে-ফেলা সম্বন্ধরচনার বিশ্বাস নিয়ে লেখক অটলপ্রায়; জৈবক্ষুধার লড়াইকেও মানবতার অনড়ত্বে অভিভূত করেন, নীতিবত্তাকে সবলস্তম্ভের মত উর্ধ্বে খাড়া করে রাখেন। তাঁর উপন্যাসে শত অভাবেও অনঙ্গ বৌ অচলা, কাপালি বৌ ক্ষুধা-বিজয়িনী। পরিস্থিতি যত খারাপ হতে থাকে, চরিত্ররা ততো বেশি মানবিক হয়ে উঠতে থাকে। গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণগিরির ভণ্ডামি বিসর্জন দেয়, ভালোমানুষের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পায়। বিভূতিভূষণ নিম্ন-কণ্ঠে উত্তেজনাহীন সুরে সময়কে ক্রমে সর্বগ্রাসী অমার দৈশিক পটে নিয়ে যান—বধ্যভূমির বিস্তারকে বিছিয়ে দেন সমগ্র গ্রামের উপর। কালিক অভিজ্ঞতার দৃশ্যচিত্র কিভাবে দৈশিক মাত্রায় পরম্পরিতরূপ পায়-'অশনি সংকেত' সেই শৈল্পিক সাফল্যের উদাহরণস্থল।

যুদ্ধ কি আমাদের জীবনকে দৈবনির্ভর বন্ধনদশা থেকে বিমুক্ত করতে পেরেছে?—এ জিজ্ঞাসাটা ঐতিহাসিক। ক্ষুধার অন্ন মানুষেরই ঘরে গোলায় অন্তরীণ-অবস্থায় থাকে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ নয়। মানুষ তাই আপদ্‌কালে মানুষেরই দ্বারে হাত পাতে, গ্রাম ছেড়ে নগরাভিমুখী হয়। দুর্ভিক্ষের আখ্যানে পরিস্ফুট হয় এই মানব-মুখী চেতনার উদ্‌গম, করালসংহারমূর্তি সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ মানুষকে তীব্রভাবে জৈবিক-প্রতিরোধে যুক্তিশীল করে তোলে। এভাবে যুদ্ধ-প্রতিবেশ থেকে আধুনিক সময়ে মানবাত্মার আরেক রকম উত্থান জেগে ওঠে এবং এই জেগে-ওঠা অস্তিমও মানবতাকেই পুনর্বার চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে—আবেগ বহির্ভূত অভিজ্ঞতায়। এই মানবতা সময়-সংকটজাত, তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত ও অতিক্রান্ত একটি বাস্তবতা—নিছক ভাববাদী প্রত্যয় নয়। কমলকুমার মজুমদারের ভিন্নরূপী গদ্যশৃঙ্খলায় এই পরীক্ষিত মানুষগুলোর অভিযাত্রিক-চেহারা, স্বাভাবিকত্ব ও সংঘবদ্ধ রূপমূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আশ্চর্য সফলতায়। দ্রষ্টব্য, 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পগ্রন্থ অথবা 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসের চরিত্রাবলী ও ঘটনাপ্রবাহ। লেখক একটি প্রতীকী-রূপবন্ধের প্রয়োগে যুক্ত করেন হাজার-বছর বাহিত আকালের যাত্রীদের ব্রতকথার আখ্যানকে; তাদের ব্যক্তিগত সন্নিবেশে ফুটিয়ে তোলেন তন্নিষ্ঠ অনুপুঙ্খ জীবন-মমত্বকে এবং যদিও মূর্তিমান ক্রোধ হয়ে তারা অসহায়ত্বে আত্মসমর্পিত, কিন্তু এই "ক্রোধ বাস্তবতার অনড় পিণ্ডর তুল্য অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে মানুষের নিয়তিকে"[১২] অপ্রতিরোধ্য ভাববার বিরুদ্ধেই উত্থাপিত-ক্রোধবিশেষ।

আমাদের জাতীয় আবেগে বাস্তব-ব্যত্যয় সত্ত্বেও চিরকালই ছিল ধন-ধান্যসমৃদ্ধ একটি স্মৃতির প্রতিচ্ছবি—যাতে আমাদের জাতীয়সত্তার মূল কাঠামো ও স্বতঃচল প্রবাহটি ছিল রূপকীকৃত।[১৩] সোনার বাংলার মোহপ্রবণ সংস্কারবোধে বাস্তবত উৎকট দারিদ্র্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও—সর্বদাই ছিল বিশ্বাসের শক্ত মাটি। যুদ্ধ সেই মোহবিচ্যুতির মধ্য দিয়ে বাস্তব-বীভৎসতায় জীবনকে বিদ্ধ করে এবং সমৃদ্ধির কল্পনাঘেরা তার সাংস্কৃতিকচেতনার কাঠামোতে ধ্বংসের সৃষ্টিকরে। এই ধ্বস-ভাঙনকে কেউ কেউ তাঁদের শিল্প-রূপে অনুষঙ্গ হিসেবে সাঙ্গীকৃত করে নিতে সমর্থও হয়েছিলেন। কবিতায় গানে বা 'নবান্ন'-র মতো উন্মুখর'—নাট্যে সোনার বাংলার শ্মশানরূপী প্রকৃত চেহারার প্রতি নগ্ন আক্রোশ ঘোষিত হলেও গল্পে-উপন্যাসে সে-বিনষ্টির দৃশ্যছবি রোমাণ্টিক চিৎকারে বা সরলীকরণে প্রতিবিম্বিত হলনা। ক্রূর বাস্তব ও কালসীমার ভয়াল রূপের সত্যতা এখানে গূঢ়-অবতলসমেত যেন প্রকট হয়ে উঠতে চাইল। সে-সঙ্গে কার্যকারণ ও ধ্বসের ফাটলগুলো চিহ্নিত করণের প্রয়াসও দেখা দেয়। পাশাপাশি মহাযুদ্ধ-পটে উত্থিত গণ-অভ্যুত্থানের বিপুল তরঙ্গপ্রবাহ[১৪] বোধকরি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জীবনের প্রতি তাকানোর রোমাণ্সকে। ব্যক্তির একতম নায়কত্বের মহিমা খর্বিত, ভূমিকা ও অবসিত, পরিবর্তে স্ফুটতর হচ্ছে সমবেত দেশকর্মীর বীরত্বের ঈস্পাতদৃঢ় চেহারা; ছোট-খাট আত্মত্যাগে জীবনগড়ার প্রবাহকে সঞ্জীবক করবার প্রয়াস চলছে। এবং সে সঙ্গে জাগছে দেশজ উত্তরাধিকারের মহান, বিশালকায় রূপের প্রাণমূলে পৌঁছানোর অভীপ্সা। সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা তারাশঙ্কর এ-সূত্রেই জীবনের পরিবর্তমানতার মহাকাব্যকে খুঁজেছেন আঞ্চলিক জনপদের অভ্যন্তরীণ ছন্দ-তরঙ্গে—যেখানে বিধৃত আছে একই সঙ্গে আমাদের মিথিক্যাল ব্রতকথা এবং প্রতিজ্ঞা ও নিয়তির আয়ুধসমূহ—অবৈকল্যে। তারাশঙ্কর তাই যুদ্ধ-কালে 'মন্বন্তর', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' কিংবা 'কান্না' উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বিবেকপটে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে সময়ের সর্বনাশকে প্রশমিত-চেহারা দিলেও তাঁর শিল্পপ্রাণতার যথার্থ ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন আঞ্চলিক জীবনছন্দের পরিসরে।

প্রশ্ন জাগে বাংলা উপন্যাসে প্রকৃত অর্থেই যুদ্ধোপন্যাসের দেখা পাওয়া কেন দুষ্কর। যুদ্ধের আবহ ও সংঘটনাকে ব্যক্তিসম্পর্কের ডাইনামিক গতির স্বতঃচলতার মধ্য দিয়ে প্রতীকীরূপে ধরবার প্রয়াস যেন অধরাই রয়ে গেল—যেমনটি রয়েছে সার্ত্রের ত্রয়ী উপন্যাস Roads to Freedom-এর মধ্যে,

রয়েছে হেমিংওয়ে, ইলিয়া এরেনবুর্গে এবং সার্বভৌমরূপে টলস্টয়ে। কারণ বোধকরি এই যে পুঁজিবাদ সংরক্ষণ স্বার্থে সংগঠিত যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিলনা, অনিবার্যও ছিলনা ; অথচ অপ্রতিরোধ্য ছিল যুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ও পরিণতির সকল দায়দায়িত্বের ফলভোগ—অবক্ষয়-নারী নির্যাতন-ক্ষুধা-কালোবাজারী-বেকারত্ব—এসবের মধ্য দিয়ে পরিবার-সমাজের ভাঙন। এক্ষত্রে পতনোন্মুখ-বাস্তবতার প্রতিরূপ থেকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষরূপটির ভয়াবহ—উৎসে যাওয়ার পন্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। এবং যুদ্ধরূপের ভেতরকায়াটি চূড়ান্ত অর্থে শিল্পী কতটুকু ছুঁতে পেরেছেন—সে-প্রশ্নে দ্বিধান্বিত থাকতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রের প্রতিরোধ ও মৃত্যুর মধ্যে বাস না করলেও বীভৎস-মন্বন্তরের মধ্যেই প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে প্রকৃত ক্ষতের গোপন উৎসটি। য়ুরোপীয় জাতিগত-যুদ্ধপ্রয়াস মুনাফালোভী শস্যব্যবসায়ীর অর্থনীতির জট উন্মোচিত না হলেও লেখকরা ঠিকই বুঝেছিলেন এই দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ—সবই মনুষ্যসৃষ্ট—প্রাকৃতিক ঘটনা নয় দৈবনির্দেশও নয় এবং নয় আপতিকও, বরং পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রমঘনায়মান পুঞ্জীভূত লোভের সংকট। ফলে সীমিত অর্থে হলেও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দৃশ্যছবি কোথাও কোথাও সংকেতিত হয়েছে, কোথাও বা মধ্যবিত্তের চেতনার বিবেকজ্বালার উৎসারণে অভিব্যক্ত হয়েছে। এমনকি "অশনি সংকেতে'র মতো একরৈখিক রূপা-লেখ্যেও গ্রামের মোড়ল বিশ্বাস মশায়ের মাথায় রাতের অন্ধকারে লাঠির বাড়ি পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জমে-ওঠা ক্রোধকে এ-সূত্রে আর ইঙ্গিতময় করে রাখেননা, সেই ক্রোধকে, ক্রোধের স্বরূপকে সচেতনতায় বিশ্লিষ্ট করেন। 'চিন্তামণি' উপন্যাসের একটি অংশ——

> অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে দুর্যোগ চড়ে নামে ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা গোলমেলে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভাল ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনাভোগ, জমিদার, দোকানি, পসারী, আত্মিয়-পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহারে বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিত নিষ্ঠুরতায় লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পর যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।"

এই বিদ্বেষ-গর্ভেই শ্রেণীসত্যের স্বরূপটা অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। এবং তার সঙ্গে আছে অ-নিরপেক্ষ শিল্পীচেতনার অঙ্গীকার প্রবণ চৈতন্যের দায়িত্ব বোধ—আজকের যুগে নিরাশ্রয়ী সমাজে শিল্পীর ভূমিকা যে-দায়িত্ববোধ দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হওয়ার অনুজ্ঞা বহন করছে।

গ. যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ও অনুধ্যান : বাংলাদেশের উপন্যাস

দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সময়প্রবাহের একটি পর্ব হিসেবে প্রবিষ্ট হয়েছে,—যুদ্ধকালকেই সম্পূর্ণতায় জীবন-পট-ভূমি করে তোলা হয়নি। কারণ, বিভাগ-পরবর্তী উপন্যাসের চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের একটি ভিন্ন-প্রতিবেশে। এই-প্রতিবেশ আবার তৎকালীন দেশকালের বহমান সংক্রান্তি-সংকটের ক্রোড়সম্ভূত। কাজেই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব-মাত্রা এখানে কেন্দ্রগ-রূপে বিবেচ্য নয়, লেখক-দেরও পাবনা সেই অবস্থানে—যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বাধ্যত সময়সন্ধির জটিলতায় আত্মবিজ্ঞাপিত হন। লেখক যেখানে সময় তৈরী করতে পারেন না, সময়ই তাঁকে রচনাক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে—এরকম যুদ্ধ-প্রতিবেশের চাঞ্চল্য ও উত্তুঙ্গ অবস্থান অনেকাংশেই নির্লক্ষ্য।

যাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শক, সেসব শিল্পীর পরবর্তী সময়ের রচনায়—পঞ্চাশের শেষার্ধ থেকে ষাটদশক ব্যাপী কালে রচিত উপন্যাস-ছোটগল্পে যুদ্ধরূপ প্রতিভাষিত চেহারা নিয়েছে, স্মৃতির সূত্র এবং শিল্পরূপের বৈষয়িক প্রাসঙ্গিকতায় অনুধ্যান হিসেবেই পরিগৃহীত হয়েছে। বিশেষত, উপন্যাসের-জীবনপটে ব্যক্তির জগতে একটি বিভক্তকৃত দুঃসময় হিসেবে যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত। এ ধরনের কিছু রচনা হচ্ছে, আবুল মনসুর আহমদের 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৫), আবু রুশদের 'সামনে নোতুন দিন' (১৯৫৬), আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), বুলবুল চৌধুরীর 'প্রাচীর' (১৩৬১), আলাউদ্দিন-আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫), সরদার জয়েনউদ্দিনের 'অনেক সূর্যের আশা'(১৯৬৬), সত্যেন সেনের 'সেয়ানা' (১৩৭৬), আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪), শামস রশীদের 'উপল উপকূলে' (১৯৬৯-৭০) এবং আরও কিছু কিছু। এসব উপন্যাসের পরিসর বড়, বিস্তৃত-সময় ও দেশকে রূপান্তর-ক্রিয়ায় ধরবার প্রয়াস রয়েছে; চরিত্র সময়-দৈশিক আয়তনে মাত্রা-

বৈচিত্র্যে বিবর্ধিত চেতনার অভিমুখী। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের পীড়নকে মধ্যবিত্ত চৈতন্য-বোধের বৃত্তে অনুধাবনের প্রয়াস শেষাবধি অনুধ্যানে অবসিত। ফলে এসব রচনায় একরৈখিক সমানুভূতি ও বিবেকের বহিঃস্থ রূপটাই প্রকটিত। ব্যক্তির মনোজগতে যুদ্ধের উৎকটরূপ, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি তাদের একধরনের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে বটে; কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্মান্তর শিল্পিত হয়ে উঠেনি। বস্তুত, যুদ্ধের স্মৃতি জনগোষ্ঠির বুকে দীর্ঘকাল জেগে থাকে একটি প্রবহমান পীড়নের মতো, পরম্পরাগত স্মৃতিসঞ্চরণে তা বাহিত হতে থাকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি-অন্তরে। উপন্যাসে সেসব স্মৃতিসঞ্চারই ষাটদশকের দেশজ সত্তার নিষ্কাশনে-আলোড়নের মধ্যে সঞ্জীবিত হতে চেয়েছিল ; আবার এই ষাটের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল আন্দোলনে-সৃষ্টিতে একাত্তরের যুদ্ধচেতনা। একাত্তরের যুদ্ধ-অনুষঙ্গ পরবর্তীকালকে প্লাবিত করেছে, চল্লিশের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কি পঞ্চাশ বা ষাটকে সে-ভূমিকায় বিলোড়িত করতে পেরেছে? উল্লিখিত সবগুলো উপন্যাসের সংগঠন একরকম নয়, শিল্পীভেদে রূপ ও অনুচিন্তনে পার্থক্য রয়েছে।

'ক্ষুধা ও আশার' ক্যানভাসটি বড়, সমাজবাস্তবতার অনুবর্তনও যথা-সম্ভব প্রবলতরো। তবে ব্যক্তির অন্তর্লোকাশ্রয়-প্রবণতা সবিশেষ বলে যুদ্ধপ্রসঙ্গ এবং একইসঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন ('৪৭ এর দেশভাগ) ও দুর্ভিক্ষের করালরূপ—এই ত্রয়ীতরঙ্গ একক দৃষ্টিকোণে একটি মাত্রাকেই রূপান্বিত করেছে। যদিও প্রত্যয় আছে এরকম বক্তব্যের বিবৃতিতে, "যুগচক্রের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই লুতাতন্তুর মতো আমরা জড়িয়ে পড়েছি। ···এ এক প্রচণ্ড অগ্নুৎপাত; খণ্ডপ্রলয়। এই প্রলয়ের আগুনের আভায় আমাদের পরস্পরের মুখ চিনে নিতে হবে···।" যুদ্ধকেও ইতিবাচক জীবন-সংগ্রাম হিসেবে ভাবা হচ্ছে—যারা উষর মরুভূমিতে প্রাণ উৎসর্জন করছে—তারা শেষপর্যন্ত ধ্বংসের মাঝে নব্যসৃষ্টির পত্তন করবে। কিন্তু ব্যক্তি এখানে ঘটনার সাংকেতিক তাৎপর্য সন্ধানের ক্ষেত্রে ঔৎসুক্যে বিহ্বল প্রায়, ফলে বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যুদ্ধঘটনার প্রতীকী তাৎপর্য—যা রচয়িতার অভিপ্রেত, তা উপলব্ধির অন্তঃস্রোতবাহী হয়ে ঘূর্ণিত হয়েছে কিন্তু অনু-ষঙ্গময় হয়ে উঠেনি।

'অনেক সূর্যের আশায়'-ও জীবন-যুদ্ধের বহুভুজ চিত্রে যুদ্ধপ্রসঙ্গ রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তির প্রাধান্যে ক্ষতিগ্রস্তপ্রায়। এখানে নায়ক কবি, সে যুদ্ধাবস্থায়

কাব্যময়-চেতনা দিয়ে দেশান্তরে যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব; দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি ও নৈতিকতার পতনকে অবলোকন করে। উপন্যাসটি স্মৃতিমূলক, ১৯৫১-তে দাঁড়িয়ে অতীতের মধ্যে বিচরণ,—স্মৃতির প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে ঘটনারূপের স্বরূপ-সন্ধানের প্রয়াস এবং নব্যরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে আশাবাদ-ধ্বনিত। 'পদ্মা মেঘনা যমুনায়' দ্বিতীয় মহযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অবস্থানটি সমতলধর্মী; যুদ্ধের সন্ত্রস্ত চেহারা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উচ্চতায় হয়ে পড়ে নিমুস্থ। তবে ঘটনার টানাপোড়েনে ভেসে যাওয়া জীবনের খণ্ডদৃশ্য রয়েছে, গ্রামের বিপর্যয় রয়েছে, অসহায় সমর্পণ ও করুণপরিণতির নানা ইঙ্গিতও রয়েছে। তবে সবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাবৃত্তে কল্পনা ও অতিরেক আবেগে গ্রস্ত; তদুপরি তাতে যুক্ত হয়েছে রচয়িতার জীবনকে আদর্শায়নের অভীপ্সা।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ স্পষ্টতায় উচ্চারিত, মাতৃ-স্তনপানরত শিশুর প্রতীকে জীবনজয়ের সংকেত অভিব্যক্ত এবং এসব উপন্যাসে প্রায়শ যুদ্ধ-প্রসঙ্গ দেশজ-আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পর্যবসিত হয় একটি সংবাদসূত্র হিসেবে। সূত্রটির লক্ষে নিবদ্ধ থাকে আশাবাদী জীবনভূমির সংগঠন। ফলে যুদ্ধকালীন সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির সূত্রাবলি কারও কারও লেখায় উল্লেখিত হয় তার প্রতি ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত হয়। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে রচিত এসব উপন্যাসে (অবশ্য 'পদ্মা মেঘনা যমুনার' প্রকাশকাল ১৯৭৪) বিশ্ব যুদ্ধ নায়কনায়িকার অনুভাবনায় দূরান্বয়ী-সম্পর্কেই ধৃত হয়েছে, আবার পাকিস্তানোত্তর প্রতিবেশে লেখকমনের স্বপ্নভঙ্গ-বেদনার সংযোগে যুদ্ধ-বেদনার তাৎপর্যটি লঘু হয়ে গেছে। একটি তথ্য স্মরণযোগ্য যে, এসব উপন্যাসে গ্রামজীবনের বিপর্যয় ও করুণ পরিণতির সংবাদ-দৃশ্য আছে কিন্তু নেই তৎকালীন সময়ের সেই প্রতিরোধস্পৃহ জাগরণ—বিশেষত ১৯৪২-এ সোমেন চন্দের হত্যার পর ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও মন্বন্তরের প্রতি-রোধভিত্তিক আন্দোলন পূর্ববঙ্গের জেলায়-প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল লোকসঙ্গীত-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক সংগঠনের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রতিবাদের রাজ-নৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবতথ্যটি বৃহৎমাত্রায় এক্ষেত্রে অনুভূত নয়, স্পষ্টও নয়।

'সংশপ্তকে' গ্রামজীবন ও ব্যক্তিচরিত্রের মানচিত্রে যুদ্ধ প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে এপিসোডমূলক। গোটা গ্রামের বিনষ্টির রূপচিত্রে যুদ্ধের অভিশাপ

দ্বিগুণ করেছে সামন্তশোষণের রূপ-রূপান্তরধর্মী অভিশাপকে, জীবনরূপ ভাঙনের শ্রেণীভিত্তিটিও অনুদ্‌ঘাটিত থাকেনি। গ্রামের প্রতিবাদী জীবন—যে জীবন দুর্মর হয়ে গেছে শহুরে পণ্য। তবুও মানবতার অজেয় সত্তাটি শহীদুল্লা কায়সার প্রজ্জ্বলিত রাখতে পেরেছেন এবং দুর্ভিক্ষের খণ্ডচিত্রে শাসক-শোষিতের সম্পর্ক-আবিষ্কারও নিবিষ্ট থেকেছেন। এসবই তিনি করেছেন একটি দৃষ্টিভঙ্গিক লজিকসূত্রে—ঘটনা বৈচিত্র্য সামগ্রিকতায় অন্বয়-বদ্ধ হয়েছে ঐ-সূত্রেই। সেকেন্দার মাস্টার ও জাহেদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে উক্ত লজিক, তাদের ক্রোধ ও প্রত্যয় জীবনেরই বিশাল ক্রোধের অনুকল্প।

'সেয়ানা'য় যুদ্ধদুর্ভিক্ষপীড়িত সংকটের পার্শ্বচিত্র হিসেবে ইংরেজ-সৈন্যের নারী-লোলুপতার পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে। সমাজের অন্তেবাসী চরিত্রের জীবনলোকে যুদ্ধের প্রভাব-পরিবর্তন পুরো সমাজকেই ধারণ করেছে। যুদ্ধ সকলকেই বদলায়, অভিজ্ঞ করে তোলে নৈতিকতার পতন সম্পর্কে, পাপের রন্ধ্রপথ সম্পর্কে। সত্যেন সেনের উপন্যাসে একটি দৃষ্টি-কোণের জ্যোতি বিকীর্ণ—যে জ্যোতি যুদ্ধের অমানবিক চারিত্র্য ভেদ করে সমাজসত্তার মর্মতলকে উদ্ভাসিত করে, ইতিহাসকে প্রত্যয়ের দীপ্তিতে জীবন-রশ্মিপাতে যৌক্তিক করে তোলে।

'সামনে নোতুন দিন' মধ্যবিত্ত চরিত্রের সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধপ্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করেছে। পরিস্থিতির প্রতি সচেতন দৃষ্টিনিক্ষিপ্ত হয় পারিবারিক বৈঠকের আলাপচারিতায়, কখনও বা বন্ধু সমাগমে। আকালের ক্ষুধার্ত চিৎকার আত্মগ্লানি জাগায়, ভাবাবেগে ব্যক্তিকে পরিপ্লুত করে। লেখক উচ্চ ও মধ্য—দুই শ্রেণীর তারতম্য নির্দেশে মধ্যবিত্তকেই সমর্থনধন্য করেন—এই মধ্যবিত্ত তখন বিকাশশীল পর্যায় অতিক্রম করছে মাত্র; ফলে সে অতিরিক্তভাবে আত্মসচেতন, ভাবপ্রবণ এবং স্বাতন্ত্র্যবাদীও। এই ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়েই মধ্যবিত্ত যুদ্ধপ্রসঙ্গে জীবনের ক্ষতাক্ত রূপ, রক্তাপ্লুত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেনা, সে তার সত্তাকে শ্রেণী কাঠামোর দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উৎকণ্ঠ থাকে। তাই মৌলিক সমাজ-সংস্থান থেকে খুব বেশি বিচ্যুতি তার ঘটেনা। তবে কেউ কেউ যুদ্ধের পটে চেতনার ক্ষেত্রে শ্রেণীচিন্তার সম্প্রসারণ-উত্তরণ সম্পর্কে অনুভাবিত থাকেন এবং একটি ভিন্নতর সম্ভাবনার স্মারক হয়ে ওঠেন।

আমাদের মধ্যবিত্তের উত্থানকালটাই ছিল পঞ্চাশ দশকে ব্যাপৃত, পল্লী-আগত ব্যক্তি শিক্ষার সূত্রে ঢাকা নগরীতে মধ্যবিত্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে থাকলেও নগরচৈতন্যের পুরো অবয়বে বিমথিত হয়নি তখনও।[১৫] শিল্পীর সহজেই ফেলে-আসা স্মৃতির জগৎ—গ্রাম জীবনকে নাগরিকতার দোলাচলে মেলাতে চেয়েছেন, ফলে স্মৃতি এখানে সত্তাসন্ধানে খুব বেশি আত্মনিবিষ্ট থেকেছে সেই স্মৃতির মধ্যেই জীবনসত্তার কল্যাণ-অকল্যাণ সরলতা-জটিলতা এবং অংশত যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের ঘটনা অনুষঙ্গ হিসেবেই রয়ে গেছে। আর তাদের বর্তমানটা হচ্ছে পঞ্চাশের পটভূমে আত্মস্বরূপ সংরক্ষণের ব্যাকুলতাধৃত—ভাষা আন্দোলনের মিথলগ্ন। ফলে পূর্বের মারণযজ্ঞ—যুদ্ধ-স্মৃতি-প্রবীণ লেখকদের দৃষ্টিতে জীবনের উত্থান-উত্তরণের মাত্রালগ্ন হয়েই অনুসৃত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ তাঁদের চিন্তধারায় এক ধরনের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ প্রবণতার চিত্র জীবনের জয়ঘোষণার দীপ্তি এবং জাতীয়তার চেতনা কাজ করেছে। বস্তুত, এসব ইতিধর্মী চেতনা অবশ্যই ১৯৩৯-৪৫-এর সময়কালে বিবর্ধিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রতিরোধস্পৃহা থেকে আলাদারূপেই বিবেচ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বদলে যান 'দর্পণ' লিখে—যুদ্ধকালে, অথবা বিষ্ণু দে 'পূর্বলেখের' (১৯৪১) ডাইরেকশনে এবং আরও কেউ কেউ দীক্ষিত হন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চেতনায়—মার্কসবাদে, অন্যভাবে সত্যেন সেন শহীদুল্লা কায়সার এমনকি অংশত আলাউদ্দিন আল আজাদ অথবা আবু জাফর শামসুদ্দিন মার্কসীয় চৈতন্য নিয়েই পরবর্তী দশকে যুদ্ধ কালটিকে অনুশীলিত করেন। তাঁদের ক্ষেত্রে স্মৃতির বিচরণ যতোটা অন্তর্চেতনাপ্রবাহ থেকে উত্থিত ততোটাই তা যুদ্ধপ্রসঙ্গ-প্রতিক্রিয়াকে করেছে আংশিক দূরতর। যুদ্ধকালীন রচনার বেদনাতীব্রতার ছোঁয়া অনেকাংশেই অব্যবহিত নয়।

স্মৃতি-সংলগ্ন যুদ্ধ তাই দৈনন্দিন জটিলতা বাদ দিয়ে শিল্পীকে নিয়োজিত করে ব্যক্তিনায়কের আত্মসত্তা আবিষ্কারে—দ্বৈধ বাঙালিসত্তার পুনরুদ্ধার-কল্পে। এটা গোটা মানবজাতির দুর্ভোগ-সংকটের পরিমণ্ডল নয়—শুধুই নতুন একটি রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয়ের গভীর মূলের বক্রতা এবং আশা-বাদের সূতোয় ঝুলে থাকার বাস্তবতা। কেননা ভাষা আন্দোলনের দীপ্তরশ্মি বীভৎস যুদ্ধ-ধ্বংসকে পরিশ্রুত করে দিয়েছে নব্যস্পন্দনে। তাই ব্যক্তিক স্মৃতিপ্রবাহ—চেতনাপ্রবাহরীতির চর্চা হয়ে ওঠে উক্ত উপন্যাসগুলোর

শিল্পরীতি।[১৬] আবার ষাটদশকের অবরুদ্ধ কালপ্রবাহ-তাড়িত এসব রচনায় লেখকরা অন্তর্গতসূত্রে আয়ুবী শাসনপিষ্ট মধ্যবিত্তের ক্রত আশাভঙ্গের বেদনা ও বন্দীচৈতন্যকেই যুদ্ধপ্রসঙ্গের অতীত ঘটনা থেকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। সার্বিক অর্থে বিশ্বযুদ্ধের বৃত্ত তাই দূরাবলোকনে, অনুধ্যান-প্রাসঙ্গিকতায় এবং আত্মসত্তার পরিব্রজনায় হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র মাপের একটি ঘটনা। প্রসঙ্গত, ভাবনা জাগে, মহাযুদ্ধের পঙ্কিলস্রোতে হিন্দু মধ্যবিত্তের অবক্ষয়-ভাঙনের সঙ্গে ইতিহাসের কালচক্রের নিয়মে জড়িয়ে গেছে মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বাতন্ত্র্য-অর্জনের আকাঙ্ক্ষা—তার বিবর্ধনের সময়কাল এবং নব্যমুসলিম মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীর রোমান্টিক প্রেমপটে জীবনধ্যানের পালাক্রম। এবং যেহেতু এসবই অবয়ব পরিগ্রহ করছিল চল্লিশ দশকের উত্তাল-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে, ফলে যুদ্ধ-প্রতিবেশ তাদের ক্ষেত্রে সংগঠনের পাদপীঠ হিসেবেই বিরাজমান, রশীদ করিমের 'উত্তমপুরুষে' আত্মজৈবনিক ধারায় প্রেমের পাদমূলে জীবন-ধ্যানের গঠন-কল্পনাই মুখ্য হয়ে ওঠে—যুদ্ধ সেখানে প্রতিচিত্রের মতো—কখনও-বা ছায়াচিত্রের মত জীবনের পেছনে থাকে—জীবনের-অভ্যন্তর কেন্দ্রিক হয়না, সম্মুখবর্তীও নয়।

সত্তরের পরে রচিত উপন্যাসে প্রসঙ্গটি আরও দূরস্থ এবং কালিক অবধান মাত্র, কখনও বা মূলতই একটি প্রতিভাস—লেখক প্রতিভাস থেকে যুদ্ধকে এককভাবে ধরতে চাননি; চেয়েছেন সংস্কার চৈতন্যের সত্তাসংকটে, আরেকটি সংগ্রাম-বিজয়ের ঘটনার প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে অতীতকে পর্যবেক্ষণ করতে। ঢাকা শহর ইতোমধ্যে মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠায় ও বিবর্ধনে পরিবৃত। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তার মিথ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধভাবনাপটে এই মধ্যবিত্ত কিছুটা উন্মথিতও বটে। অর্থাৎ প্রতীক ও অস্তিত্বের মেল-বন্ধনের পরীক্ষণে মধ্যবিত্ত এখন প্রকৃত সংকটের মুখোমুখি অবস্থানে আছে। একাত্তরের মধ্য দিয়ে পাকবাসীর যুদ্ধ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গ্রামসংস্পর্শ ঘটেছে প্রত্যক্ষভাবে এবং যুদ্ধশেষে শহরে তারা ফিরেও এসেছে। মধ্যবর্তী নয় মাস খুব একটা দীর্ঘসময় নয় এবং তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে মুসলিম মধ্যবিত্তের সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব ষাটের উপন্যাসে যে-মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছিল,—যাতে ছিল একই সঙ্গে স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার ছন্দপতন, এবং আশাবাদের প্ররোচনা, সেই মধ্যবিত্ত সত্তর-এর পরে মূল্যবোধের বিনষ্টিকে আপাদমস্তক প্রত্যক্ষ করল। সংস্কার-বিন্যাসের পরিবর্তন-পটে শিল্পীর দৃষ্টিলোক চল্লিশ বৎসর পূর্বে সংঘটিত মহাসমরকে কি ভাবে দেখছে

তখন ? এক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনা হয়ে উঠেছে তাঁদের উৎস-উপাদান—যা পঞ্চাশষাটের ইতিহাসজ্ঞান থেকে দূরবর্তী। তখন অতীতপরিক্রমা ছিল মধ্যবিত্তের বিকাশের রূপরেখার সূত্রে ঐতিহাসিক সময়কে আঁকা—আর বর্তমানে এঁরা বাঙালির সংগ্রাম ও প্রত্যয়ী-সত্তার উৎসকেন্দ্রকে ধরতে চেয়েছেন মূলভূমিতে দাঁড়িয়ে। সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি'তে এ-সূত্রেই ফ্যাসিবিরোধী লেখক সোমেন চন্দের ব্যক্তি-প্রতিকৃতি প্রতীক হয়ে ওঠে; শিল্পীর দৃষ্টি এখানে বিশ্বযুদ্ধের কালকে প্রতিরোধের প্রত্যয়ে ধারণ করে—মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাট্যরচনায় সংকেতময়তায় তিনি প্রতিবাদের রাজনৈতিক মাত্রাকে কালের বুকে পরিচিত্রিত করতে উৎসুক হয়েছেন।

কারও লেখায় যুদ্ধবিরোধী চেতনাই নির্বিশেষ হয়ে ওঠে, তাদের লেখার খাতে রূপক-প্রতীকের অর্থময়তা অনিবার্যভাবে প্রবিষ্ট হয়। যেমন মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এ যুদ্ধবিরোধী চেতনা সার্বভৌম রূপ পায়, শওকত ওসমানের 'সমাগম' উপন্যাসেও রূপক পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বায়নে ফ্যান্টাসির আবহে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা ও অবরোধের সংকল্প ঘোষণা করেন বিশ্বের সকল বিবেকবান শিল্পী সাহিত্যিক। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর শেষতম উপন্যাস 'তুলনাহীনা'য় তাঁর স্বকীয় রসবোধের চর্যায় বিধৃত করেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমে যুদ্ধবাজদের পাশবিকতার চিত্র—স্বপ্নচারিতার মধ্যে হিটলারের স্বারুপ্যে পটভূমিকে দেন বিশেষ তাৎপর্য।[১৭] পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের—বর্তমান-অতীতের নানারূপী ছদ্মবেশকে খণ্ড খণ্ড ভাবে অখণ্ডতায় উদ্‌ঘাটন করেন জহীর রায়হান 'আর কতদিন'-এ।

যুদ্ধবিরোধী চেতনাকে আয়ুধ করে শিল্পী মানব-প্রজাতির বিবেক ও দুঃসাহসকে নিয়ে ব্রতকথা রচনা করেন। কিন্তু অপশক্তির উৎকট-জিঘাংসা শিল্পীহননে কখনও কুণ্ঠিত হয়না।[১৮] ইতিহাসে শিল্পী হত্যার পাপ খুবই পুরোন, পাশাপাশি মননে-অন্বেষণে শিল্পীর পবিত্র, মহিম অভিযাত্রাও অনেক বেশি পৌনঃপুনিক, অপরাজেয়।*

---

* বিভীষিকাময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, তারিখ ২৩-৯-১৯৮৯, স্থান : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

তথ্যনির্দেশ

১ Jean Giraudoux, Plays vol. I. trans. by Christopher Fry, London, 1955.

২ ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রথম অবস্থা, তার বিকাশ ও প্রসার—সবই ছিল বিচিত্র ভাবসংঘাতপূর্ণ, নানা মতাদর্শে প্রভাবিত। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা', সুস্নাত দাশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা।

৩ মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়ম ফিল্ডিং ওগবার্ন বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে আমেরিকার জন্য শুভময় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তথ্যসূত্র, 'সামাজিক পরিবর্তনে যুদ্ধের ভূমিকা', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮১, ঢাকা। এ-সম্পর্কিত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য রয়েছে Studs Terkel লিখিত The good war নামক গ্রন্থে, Ballantine Books, New York প্রকাশনা।

৪ উল্লিখিত কবিদের রচিত যুদ্ধবিষয়ক কবিতার জন্য দ্রষ্টব্য, 'বিশ শতকের যুদ্ধবিরোধী কবিতা', অনুবাদ করেছেন অশোক রাহা, ১৯৮৮, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা। তাছাড়া যুদ্ধপরিবেশে বসবাসরত জীবনাভিজ্ঞতার গল্পরূপ বিধৃত হয়েছে 'ফ্যাসিবিরোধী জার্মানির গল্প' সংকলনে, অনুবাদ ও সম্পাদনা সৌমিত্র লাহিড়ী, জি. আর. টি. পাবলিকেশন, ১৯৮৮

৫ 'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য', সমুদ্রের মৌন, বিষ্ণু দে রচিত ভূমিকা, প্রমা প্রকাশনী ১ম প্রকাশ ১৯৪৬

৬ Alfred H. Barr, Picasso ; fifty years of his art, London 1975.

৭ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুবাদিত 'ব্রেশটের কবিতা ও গল্প', প্রমা, কলকাতা ১৯৮০, পৃ. ৩৩

৮ দ্রষ্টব্য, 'বিশ শতকের যুদ্ধবিরোধী কবিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৯ Ionesco, Fragments of a Journal, trans. by Jean Stewart, Faber & Faber, London, 1968.

১০ বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন 'ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা', পূর্বোক্ত

১১ যুদ্ধ-মন্বন্তরকেন্দ্রিক গল্পসংকলনের তৎকালীন প্রকাশনা হচ্ছে পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর', জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স-লিমিটেড, মার্চ ১৯৪৪

১২ দেবেশ রায়, 'সময় সমকাল', অন্বেষা, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ৪৩

১৩ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্প-সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধে, অনুরাধা রায়, অনুষ্টুপ, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৯৬

১৪ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কর্মযজ্ঞের তথ্য পাওয়া যাবে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা' গ্রন্থে, পূর্বোক্ত

১৫ তথ্যসূত্র, 'কথা ও কবিতা', আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১০৭

১৬ তথ্যসূত্র, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

১৭ সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত 'হিটলার' গ্রন্থে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ন্যাৎসি শক্তির প্রকৃতরূপ অনুধাবনের প্রয়াস-চিহ্নিত, কিন্তু উপন্যাসে-ছোটগল্পে যুদ্ধপ্রসঙ্গ দুর্লক্ষ্য। 'তুলনাহীনায়' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) একাত্তরের পাশবিক অত্যাচারের চিত্র আছে।

১৮ স্পেনে লোরকা-হত্যা ছাড়াও নাৎসিবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন ফ্রান্সের অনেক শিল্পী সাহিত্যিক, যেমন মাক্স জ্যাকব, রবের দেস্‌নস্, গাব্রিয়েল পেরি, ঝাক দ্যকুর, ঝঝ্ পলিৎসের, ব্যাঁঝামাঁ ক্রেমিথ্যো, ব্যাঁঝামঁ্যা ফঁদান, সাঁ-পল-রু প্রমুখ।